বললুম। তুমি বিশ্বাস কর, না কর, আমার মনে আমি যতই ভেবেছি ততই ঐ জাতটার বিশ্রী কদাকার রূপ, বদ অভ্যাস, কুব্যবহার আমার মনের কোণে জেগে উঠেছে। কেমন করে তাদের আমি মানিয়ে নিয়ে চলব ? না তা হতে পারে না! কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি সংসার গড়তে পারব না।

পত্নী অনুরক্ত যুবক ভবেশের নিকট অজয়ের এই কথা গুলি এতই অদ্ভুত ও বিশ্রী শুনাইতে লাগিল যে সে তাহার প্রতিবাদ করা সময়ের অপব্যবহার মনে করিল; বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ভবেশকে নিরুত্তর দেখিয়া, উত্তেজিত অজয় বলিয়া যাইতে লাগিল, বিরক্ত হচ্ছ দাদা, তা হলে আমি উপায়-হীন, এ গুলো আমার মনের নিভৃততম প্রদেশের কথা! এত দিন এটা আমি অপরের নিকট গোপন রেখেছিলেম, আজ প্রকৃত বন্ধু বলে তোমার কাছে প্রকাশ না করে পারিলেম না। কিন্তু দাদা, এ পাগলের প্রলাপ নয়, অনেক ভেবেছি। কে না জানে, সীতা হতে নারীরূপে কত বৃথা লোকক্ষয় হয়েছে; কত জাল, জুয়াচুরি প্রবঞ্চনার সৃষ্টি হয়েছে।

ভবেশ এবার সত্যসত্যই উত্তেজিত হইল। জোরের

সহিত বলিল, মিথ্যা কথা! নারীরূপ স্বর্গীয় পবিত্র জিনিষ। এই মারামারি, কাটাকাটি আমাদের সৃষ্টি। আমাদের নীচমনের অভিব্যক্তি।

অজয় বলিতে লাগিল, এ কথা আমি মানতে রাজী নই, দাদা। পশু পক্ষী পতঙ্গ যে দিকে চাও, দেখবে স্ত্রীজাতি সুন্দরী নয়। তারা দুর্ব্বলা পরাধীনা এবং তজ্জন্য যত কিছু দোষ তাদের ভিতর দেখতে পাবে। কলহ-প্রিয়া, মিথ্যাবাদী নারীজাতির রূপ যৌবন ক্ষণ স্থায়ী। পুরুষের যৌবনের কাছে উহার মূল্য কতটুকু?

উত্তেজিত ভবেশ বলিল, তুমি কি বলতে চাও এত কাল ধরে কামিনীর রূপগান সবই মিথ্যা? যা হয়ে এসেছে, সব মিথ্যা; কবির কবিত্ব প্রেমিকের বিরহগীতি, সতীর পতি-ভক্তি শুধু মায়ামরীচিকা? মিথ্যার চাতুর্য্যিতে পরিপূর্ণ?

—না, সব কামুকের প্রলাপ। সৃষ্টি কর্ত্তার ইঙ্গিতে মোহাচ্ছন্ন জীবের কাকলী। তর্কে এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হবে না। এ আমার মনের কথা। আমার মত আমি সহজে বদলাতে পারব না।

চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ভবেশ জোর করিয়া চেয়ারখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি নিশ্চয় বলতে পারি অজয়, হয়ত তুমি মনে ব্যথা পেয়েছ, কোন

স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েছে। তাই [illegible] প্রেমের করুণ কাহিনী তোমার মনের ভিতর ফল্গু নদীর মত বয়ে যাচ্ছে। এ শুধু তাকে চাপা দিয়ে নিজের সত্তাকে ভূলে যেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা। এ সফল হবে না, হতে পারে না। সময়ে তোমাকে মত বদলাতে হবেই। তবে আশা করি, শীঘ্র শীঘ্র [illegible] ভাল হয়।

অজয় কাতর মুখে বলিল, ও অনুরোধ আমায় করোনা দাদা। তবে এ কথা তোমায় বলতে পারি যে, আমি হতাশ প্রেমিক বা প্রবঞ্চিত যুবক নই এবং মনকে খুব শক্ত না করে বাড়ী যাব না ঠিককরে বসে আছি, কিন্তু [illegible] দুঃখের বিষয় মা আমাকে বারবার আকুল আহ্বানে ডাকছেন।

ভবেশ বলিল, তোমার ত কোন ভয় নেই তোমার অত বড় শক্ত মন সহজে বশীভূত হবে না, সহজে তুমি জীবনের সাধনা ভূলবে না, সে আমি ঠিক জানি। প্রার্থনা করি তুমি এমন একটী নারীর সম্মুখে পড় যে তোমার চেয়েও কঠিন, অভিমানী, পুরুষকে শক্ত হাতে চালিত করতে সমর্থ হন। তা হলে তখন দেখতে পাব নারীর প্রকৃত রূপ, আর তোমার মতের মূল্য কতটুকু?

হাসিয়া অজয় উত্তর দিল, সে সম্ভাবনা আপাততঃ নেই।

কাজেই তোমার আশাও সফল হবে না। তার কারণ আমি ইচ্ছে করিনে, অপরে আমার জন্য কষ্ট পায়।

ভবেশ বলিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভালবাসাটা প্রথমে পুরুষজাতির দিক থেকে ছুটে আসে। নারী অত সহজে ভালবাসা বিকিয়ে বেড়ায় না। পাগল তুমি, তাই এখনও তাদের বুঝতে পার নি।

—তোমার কথাটা আমি অনুমোদন করতে পারি নে! দুর্ব্বল চিরদিনই সকলকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, তার সহানুভূতি পেতে চায়। আর এই তার সম্বল।

হাসিয়া ভবেশ বলিল, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে এ তর্কের শেষ হবে না। ঠিক যেন জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। এক জিনিষই দূর থেকে দুইজনে দুই প্রকার দেখতে পায়; তাই বলে তার প্রকৃতরূপ বদলে যায় না। সে প্রকৃতরূপ একদিন না একদিন ফুটে ওঠেই ওঠে। এ শুধুই সময়-সাপেক্ষ; সে সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।

আচ্ছা, বলিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে অজয় উঠিতেছিল। ভবেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর একটী কথা ভাই। বাড়ী যা' এমন মায়ের মনে কষ্ট দিস্ না। হাতে ধরি বল আমার কথা রাখবি?

অজয় ভবেশের একাগ্রতায় ও তাহার মঙ্গলের

আকাঙ্খায় মুগ্ধ হইয়া গেল। হাত ছাড়াইতে ছাড়াইতে সে বলিল, আচ্ছা যাব; কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। আমি কারো মানা মানব না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া ভবেশ চলিয়া গেল।

* * * *

অজয় সুশ্রী ধনী যুবক, এম, এ, পড়িতেছে। মাসে মাসে মায়ের নিকট হইতে টাকা আসিত; সেও হাসিয়া আমোদে অপরকে খাওয়াইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিত। ভবেশকে সে মান্য করিয়া চলিত।

ভবেশ বয়সে বড় ছিল। আফিসের চাকরী করে। যে সামান্য বেতন পায়, তাহাতে কোন রূপে মেসের খরচ চালাইয়া দশ বার টাকা মাসে মাস বাড়ীতে দেয়। পরিমিত-ব্যয়ী ও স্বল্পভাষী এই যুবককে মেসের মধ্যে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

আজ কোন বিশেষ কারণে আফিস হইতে আসিয়াই ভবেশ অজয়ের ঘরে ঢুকিয়াছিল কিন্তু অজয়ের মনের অবস্থায় কথাটা বলিতে পারিল না। সময় মত বলিবে মনে করিয়া, সেও বাহির হইয়া গেল।

---

[২]

মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়া ভবেশ রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিল। কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, অজয়ের কথাগুলো—না, এ কখনও হতে পারে না, এ মিথ্যা, স্ত্রীর পত্র বাহির করিয়া ভবেশ পড়িতে লাগিল—

ওগো প্রিয়তম—

তোমার কি হয়েছে? আগেত তুমি এমন ছিলে না। এতদিন গেল, একখানা পত্র দিয়েও কি দাসীকে মনে করতে পার না! আমি যে তোমার আসা-পথ পানে চেয়ে আছি। তুমি যে আমার সব, কেমন করে আমি তোমাকে একথা বোঝাব। বলবার ক্ষমতাই কি আমার আছে ছাই। এতদিনেও যদি না বুঝে থাক, তা হলে জানব আমি অতি হতভাগিনী। জীবন সর্ব্বস্ব! তোমার পায় ধরি, মিনতি করি, সামনের শনিবারে একবার এস, অনেক কথা বলবার আছে।

আসবার সময় খোকার জন্য কিছু ফল টল নিয়ে এসো। সে সব সময়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। আসি প্রিয়তম।

ইতি তোমারই—কামিনী।

পত্র পড়িতে পড়িতে ভবেশের মনের গোলমালটুকু কাটিয়া গেল। এ শনিবারে সে বাড়ীত যাবেই কিন্তু টাকা কোথায়? পিতা হয়ে রিক্ত হস্তে পুত্রের সম্মুখে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে না।

অনুতাপে ভবেশ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাগের মাথায় বড়বাবুকে কড়া কথা বলা তাহার উচিত হয় নি। সে কাল তাহার হাত ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

... ...

রাত্রি কোনরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকাল হইতেই ভবেশের মনে পড়িল, বড়বাবুর রোষ-কষায়িত মূর্তি। সম্মুখে দেবেনকে যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ওখানে লোকজন নিচ্ছে শুনছি! সত্যি না কি?

দেবেন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, সাহেবরা বলেছেন, আর কাউকে নেবেন না।

. কেন কি হয়েছে ? কার জন্য জিজ্ঞাসা করছ ?

কাতর মুখে ভবেশ বলিল আমার নিজের জন্যে ভাই। যে আফিসে reduction হচ্ছে, কখন কি হয় বলা যায় না।

দেবেন বলিল, খুব মনোযোগের সহিত কাজকর্ম্ম করবার চেষ্টা কর, আজকাল যেরূপ বাজার পড়েছে, একবার চাকরী গেলে আর কিছুতেই মিলবে না।

—সে কথা ত জানি, কিন্তু রাখতে পারছি কই ?

—বড় বাবুর খোসামোদ কর। সাহেবেরা ত নামে কর্ত্তা। যতক্ষণ ঐ জীবটীকে সন্তুষ্ট রাখতে পারো, ততক্ষণ আর কোনও ভয় নাই জানবে।

হঠাৎ ভবেশ বলিল, আচ্ছা আজ তাই করব। আজ তার হাত ধরে ক্ষমা চাইব। যদি এ ব্রাহ্মণের দুমুঠো অন্ন বজায় থাকে। নতুবা আর চাকরী করব না, মাথায় মোটবয়ে মুটেগিরি করতে হয় সেও ভাল। না হয় আলু-পটল বেচে সংসার চালাতে চেষ্টা করব।

—এ সব বাজে কথা। অনেকে ওরূপ বলে থাকে। বলি এখনও চাকরী রাখবার চেষ্টা করো। নতুবা গিন্নীর আদর, সমাজের খাতির, সব দূরে চলে যাবে, বলিয়া ভবেশের মাথা গোলমাল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া দেবেন চলিয়া গেল।

নারীর রূপ

সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া ভবেশ দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে আফিসে গিয়া হাজির হইল। ভবেশকে আফিসে দেখিতে পাইয়া রোষ কষায়িত চক্ষে বড়বাবু বলিলেন, কাল যে বড় তেজ দেখিয়ে বলে গেলে, যে আর আসব না, আজ আবার এলে কেন!

ভবেশ কোন কথা না বলিয়া, একদম উঠিয়া গিয়া বড়বাবুর হাত ধরিয়া বলিল, আমায় মাপ করুন, কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না।

বড় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বাড়ীর কড়া চিঠি পেয়েছিলে বুঝি? আচ্ছা যাও, আজ তোমায় ছুটী দিলাম! বাড়ী যাও। সোমবারে আসতে ভুলো না যেন। আর কোন দিন তেজ দেখালে তোমার চাকরী থাকবে না।

আসল কথা, কর্ম্মিষ্ঠ ও চতুর বলিয়া সাহেবরা ভবেশকে ভাল বাসিত। বড় বাবু সহজে তাহাকে ডিসমিস করাইতে পারিতেন না। সে মোটেই অ্যাফিস কামাই করিত না, তাই তাহাকে ছুটি দিয়া অনুপস্থিতির সুবিধায় দোষ খুঁজিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হৃষ্ট মনে ভবেশ বাড়ী আসিল।

* * *

শুক্রবারে স্বামীকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া পুলকস্পন্দনে কামিনীর সারা মন শিহরিয়া উঠিল। ঘোমটা টানিয়া কোন মতে হঠাৎ-দেখা লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য সম্মুখ থেকে সরিয়া গেল। সেই সুন্দর মুখের বিজলি ভবেশের মনের ভিতর খেলিয়া গেল। ধরিতে ধরিতে ছুটিয়া আসিয়া স্ত্রীর পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, পালিয়ে যাচ্ছ কেন? চিনতে পারছনা বুঝি!

এতক্ষণে কামিনীর মনে পড়িল, এই অসময়ে স্বামীর আগমনের কোনও প্রকৃত কারণ সে ত এখনও জিজ্ঞাসা করে নাই। মনের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আজ হঠাৎ যে? অসুখ বিসুখ করেনি ত?

হাসিয়া ভবেশ উত্তর দিল, অসময়ে হঠাৎ দেখতে এলেম, আমার বিরহে কতটা রোগা হয়ে যাচ্ছ।

যাও, বলিয়া সপ্রেমদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া কামিনী বলিল, সত্যি করে বল, আমার মন বড় অস্থির হচ্ছে। এমন করে হঠাৎ তুমি ত কখনও আস না।

ভবেশ তখন অকপটে স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা বলিতে লাগিল।

বড়বাবুর কথা বলিতে বলিতে ভবেশ উ... হইয়া উঠিল। দুঃখের কাহিনী ও জীবনের অত্যাচারের কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখের ভাব এমন হইয়া উঠিল, যে কামিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল—না তোমার আর এমন চাকরী করতে হবে না।

—সাধ করে কি কেউ চাকরী করে। পেটের ভাত চলবে কি করে?

মুখের পানে তাকাইয়া কামিনী বলিল, যা আছে তাতে কি তোমার একবেলাও চলবে না।

—সংসারে কেবল আমি একাত নই কামিনী, তোমরা?

—সে ভাবনা তোমাকে কেউ করতে বলছে না।

হাসিয়া ভবেশ বলিল কিরূপে চলবে শুনিই না। শুধু পাদোদক খেয়ে বুঝি।

লজ্জিত ভাবে কামিনী বলিল, তা চলে না বুঝি।

—না চিরদিন চলে না। শুধু স্বামীর ভালবাসায় পেট ভরে না।

—খুব ভরে।

—আচ্ছা আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

কামিনী বাধা দিয়া বলিল না এখন যেতে হবে না।

—তা হলে রান্নাও হবে না। শুধু গল্পেও পেট ভরবে না।

স্বামীর আহারের প্রয়োজন মনে করিয়া কামিনী বলিল, আচ্ছা যাও। আমি ততক্ষণ রান্না চড়াইগে, শীঘ্র করে এস।

রান্না করিতে করিতে কামিনীর কেবলি মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আসার আগে আমার রান্না যেন শেষ হয়ে যায়, ভগবান।

---

[৩]

রাস্তার ধারে কুঁড়ে ঘরটীতে তালা দেওয়া দেখিয়া বৃদ্ধা হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। বারান্দার ওপর বসিয়া একদৃষ্টে তালাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। কত কষ্টে কত দুঃখে সে এই সঙ্গের মেয়েটিকে বাঁচাইবার জন্য এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মেয়েটীর দিদিমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বাড়ীতে কোন জনমানবের সাড়া শব্দ পাইল না।

গৃহটী দেখিলে বোধ হয় এ বাড়ীতে কিছু কাল যাবৎ জীবন্ত মানবের চলাচল হয় নি।

বৃদ্ধাকে হতাশ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সঙ্গের মেয়েটী বলিল, এখন কি করবি দিদি?

—তাই ত ভাবছি বোন। না জানি বরাতে আরো কত কষ্ট আছে। তা যা হোকগে তোকে ত বাঁচাতেই

হবে, বলিতে বলিতে বৃদ্ধা উত্তেজিত ভাবে রাস্তার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

বালিকাটী উঠিয়া গিয়া একখানি ইট কুড়াইয়া আনিয়া সজোরে তালায় আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তালা ভাঙ্গার কোনই চিহ্ন দেখা গেল না বরং বালিকার চোখ মুখ লাল হইতে লাগিল। আরও উত্তেজিত ভাবে বালিকা আঘাত করিতে লাগিল সে স্বীকার করিতে চাহে না, কেন এমনি ভাবে আজ তাহাদের সমস্ত পথ বন্ধ হবে!

মাতৃসম বৃদ্ধার এই সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণের পরিশ্রম-কাতর-মূর্ত্তি, তাহার সুখের জন্য ব্যাকুলতা, বালিকার মনের কোণে আঘাত করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে পুনরায় বাম হস্তে তালাটি ধরিয়া খুব লক্ষ্য করিয়া তালায় সজোরে আঘাত করিতেই অর্দ্ধ ভগ্ন ইষ্টক খণ্ডটী তাহার বাম হস্তের উপর আসিয়া পড়িল। গেলুম বলিয়া বালিকা সজোরে সরিয়া দাঁড়াইতেই হাত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বৃদ্ধা মাথায় করাঘাত করিল। পরে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার হাতটী ধরিয়া সস্নেহে বলিয়া উঠিল, কি করলি বল ত

দিদি? বরাতের সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। নাজানি আরও কত কষ্ট পেতে হবে।

খুব ব্যথা পাইলেও বালিকা লজ্জায় মুখ নত করিল। বৃদ্ধা ক্ষত অঙ্গুলিটী চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিতে পারিল না। সজোরে বলিয়া উঠিল, উঃ এত রক্ত, কাপড় চোপড় ভিজে গেল যে, তুই একটু জোরে চেপে ধরে রাখ, আমি দেখি যদি কোন ওষুধ পাই। অতি কষ্টে গাঁধা ফুলের পাতা সংগ্রহ করিয়া জলের জন্য বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তায় পা দিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, একটী বয়িয়সী বৃদ্ধা পরিষ্কৃত ঘটীতে জল লইয়া স্নান করিয়া আসিতেছেন। অপরিচিত বৃদ্ধাকে এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, এখানে কি করছো বাছা?

—এই পাতাগুলোয় যদি একটু জল দিতেন......

কোন সঙ্গত কারণ মনের ভিতর খুঁজিয়া না পাইয়া সাগ্রহে বর্ষীয়সী রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হাতে ও কিসের পাতা? কি করবে ও দিয়ে?

—হাত কেটে গেছে মা। ছুঁড়িটা অসাবধানে আঙুল দুটো একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে। রমণী পাতায় জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, চলত যাই দেখিগে কি হয়েছে?

রমণী বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটীর কাছে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। সস্নেহে নিজেই জোর করিয়া মেয়েটীর আঙ্গুল দুইটী বাঁধিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে রক্ত বন্ধ হইল।

রমণী এইবার মেয়েটীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে সুবিধা পাইলেন। সুন্দর লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত সরলতামাখা মুখখানিতে কে যেন বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। দ্বাদশ বর্ষবয়স্কা বালিকা তেজোদীপ্ত ভাবে রমণীর মুখের পানে চাহিল। তিনি বলিলেন, তোমার নাম কি মা? এখানে হঠাৎ কোত্থেকে এলে?

বালিকা উত্তর দিল, আমরা বামুন। আমার নাম কমলা। এইটী আমার দিদিমার বাড়ী। বড় হয়ে ত কখনও এখানে আসি নি, তাই আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

পার্শ্বস্থিত বৃদ্ধা ঝি উত্তর দিল, বরাত মন্দ না হলে আজই কি আসত মা? ওদের ভাত কত পরে খেয়েছে। আহা পোড়া রোগে বাপ গেল, তিন দিনের ভিতর মা গেল। আহা! কি যে হল!

বৃদ্ধা রমণী সহানুভূতির স্বরে কাতর ভাবে বলিলেন— তা হলে মেয়েটীর বাপ মা উভয়েই মারা গেছেন?

—হাঁা মা। কাল রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ওর মা কত বলে মেয়েটীকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে।

আর আমি ত ওকে কোলে করে মানুষ করেছি। তাই বুকের হাড়কখানাকে বাঁচিয়ে রাখতে ঘর দুয়ার ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। গাঁয়ের লোকেও বললে, বুড়ী মেয়েটাকে বাঁচাতে চাস যদি ভিন্ন গাঁয়ে চলে যা। ঘর দুয়ার তালা দেওয়া পড়ে রইল। কি করব বল মা! কত কষ্টের মাণিক ও আমার।

সহানুভূতিতে রমণীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তা বেশ কোরেছ মা। জীবন সব চেয়ে আগে বাঁচাতে হয়। এইটুকু মেয়ে বাপমার আদর হারাল। এমনি করে আমিও ছোট কালে মাতৃহারা হয়েছিলাম। তারপর বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কমলা তোমার দিদিমা হঠাৎ তীর্থে চলে গেছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নাই। ঘরের চাবি আমার কাছেই আছে।

বালিকা রমণীকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া বলিল, তবে দয়া করে যদি চাবিটা দেন বড়ই উপকার হয়।

বৃদ্ধা সস্নেহে বালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন কোন দরকার নেই মা। এ বাড়ী অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন রয়েছে। এখন 'গুরুদশা'র সময় এরূপ স্থানে থাকা উচিত

নয়। কোন লজ্জা করো না মা, আমার সঙ্গে এস। এর পাশেই আমার বাড়ী, যতদিন ইচ্ছা মেয়ের মত থাকবে। সেখানে আমার উপর কথা বলবার কারো অধিকার নাই।

সঙ্কুচিত ভাবে কমলা বলিল, আমার বাপ মা আজ তিনদিন কলেরা রোগে মারা গেছেন। ঐ বিষাক্ত রোগের বিষ আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। এ সময়ে আপনার বাড়ীতে—

রমণী মেয়েটীকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—এই তোর ভয়? সাবধানে থাকতে হবে বলে কি অতি সাবধানী হয়ে মায়া মমতাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে! তা হলে এ সংসারের অবস্থাটী কি হয় বলত? তাই বলে আমি বলছি না যে আমি ইচ্ছা করে রোগ ডেকে আনব। তোকে কিছুদিন এখন গরম জল খেতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। তুই অবহেলা করতে চাইলেও আমি শাসন করব, কিন্তু মায়া মমতা বিসর্জ্জন দেব না।

তেজোদীপ্ত বালিকার মস্তক নত হইয়া আসিতে লাগিল। ঝিয়ের মুখের দিকে সম্মতি পাইবার জন্য তাকাইল।

ঝি রমণীর কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতে ছিল না।

গুরুদশা গ্রস্ত বলিয়া এই মেয়েকে গ্রামের কেউ আশ্রয় দিতে সাহস করে নাই, এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া বিপদের সময় সে গ্রামের লোকের কাছে একটুও সহানুভূতি পায় নাই কিন্তু আজ ভিন্ন গ্রামের অপরিচিত একজন তাহাকে কোলে করিয়া লইতে চাহিতেছে; ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছিল না। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য সে ভাবিতে লাগিল।

দিদি কোন উত্তর দিল না দেখিয়া তাহার অসম্মতি ভাবিয়া কমলা বলিল, আমরা কখন ত পরের বাড়ী থাকি নি। আমাদের নিয়ে আপনাকে হয়ত কত অসুবিধায় পড়তে হবে।

সে আমি দেখে নেব, বলিয়া বৃদ্ধা ঝিকে রমণী বলিলেন —এস ত মা তোমার বোনকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়ীতে।

ঝি কমলার হাত ধরিয়া রমণীর অনুবর্ত্তিনী হইল।

---

[৪]

সৌভাগ্যক্রমে কমলা অজয়ের মায়ের বাটীতে আশ্রয় পাইল। হরিপাল গ্রামের মধ্যে এই বাটীখানি সব চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে বিস্তীর্ণ খোলা জায়গায় ছেলেরা বিকালে আসিয়া বালক সুলভ চপলতা বশে ছুটোছুটি মারামারি করে। সকালে নিকটস্থ দুই একটী প্রজা কর্ত্রী-মায়ের কাছে অভাব অভিযোগ জানাইয়া প্রতীকার পাইবার আশায় এইখানে বসিয়া থাকে। স্বচ্ছতোয়া পবিত্র নবগঙ্গা এ বাড়ী থেকে দুই তিন মিনিটের রাস্তা। অজয়ের মা বিধবা হওয়ার পর থেকে প্রাতে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা পূজা নিয়মিত করিয়া আসিতেছিলেন।

খুব বড় জমিদার না হইলেও অজয়ের পিতা চতুষ্পার্শ্বস্থ চারি পাঁচখানি গ্রামের মালিক ছিলেন। উহার আয় বার্ষিক দশ বার হাজার টাকার কম নয়। কিন্তু হঠাৎ

দোতলা চক মিলান বাড়ী দেখিলে মনে হইত ইহাদের আয় আরও অনেক বেশী ছিল। প্রবাদ আছে, মুসলমান রাজত্বের অবসান সময়ে কোনও নবাবের ক্রোধে পড়িয়া ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পৈতৃক দেবমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া এখানে পলাইয়া আসেন এবং উপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এখানে আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষদের বদান্যতায় অনেক সম্পত্তি দেবোত্তর ও ভোগত্তরে পরিণত হইয়াছে। এখন বংশের বর্ত্তমান স্বত্ত্বাধিকারী একমাত্র অজয়।

অজয় কলিকাতায় থাকিয়া দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পড়িত। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলিয়া জ্ঞানানুশীলন তাহার জীবনের ব্রত ছিল। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে অনুশীলন করিতে করিতে প্রথম তাহার কামিনী ও কাঞ্চনের উপর বীতরাগ জন্মে।

মাতা বাড়ীতে থাকিতেন। স্বামীর পাঠাগারের অনেক বই তিনি পড়িয়াছিলেন। বাড়ীর নির্জ্জনতার ভিতর অনেক বিষয় তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করিবার সুবিধা পাইতেন। অত বড় বাড়ীতে দাস দাসীরা নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারূপে সম্পন্ন করিয়া যাইত। বিশেষ দরকার না হইলে কেহই তাহার নির্জ্জনতা ভাঙিতে সাহস করিত না।

কেবল দাসী চাকর লইয়া বাস করায় বাড়ী তাহার নিকট ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত এজন্য কতদিন ছেলেকে কলিকাতায় যাইতে বারণ করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানানুশীলনের উন্মত্ততায় ছেলে মায়ের কথায় কর্ণপাত করিত না। তিনি বিবাহের কথা তুলিলেই ছেলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত এবং কিছু দিনের জন্য বাড়ী আসা বন্ধ করিত। তিনি অনেক সময় পুত্রের সঙ্গে অনেক বিষয় তর্ক ও পরামর্শ করিতেন কিন্তু যে বিষয়ে ছেলের অসম্মতি জানিতেন, পারত পক্ষে সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতেন না। এ সম্বন্ধেও তাহাই করিলেন, কিন্তু অতি সাবধানে পুত্রকে সংসারী করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

এমন সময় কমলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মেয়েটীর চাল-চলনে ও কথা বার্ত্তায় তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, কমলা, উচ্চবংশ সম্ভূত। ও সদ্‌গুণ বিশিষ্টা। তাহার স্নেহের অজস্র ধারা ও ভালবাসা কমলার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কথা বার্ত্তায়, উপদেশে কমলাকে তিনি মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

* * * *

সকালবেলা কমলাকে ঘরের কাজে নিরত দেখিয়া অজয়ের মাতা ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, বাড়ীতে কি চাকর

চাকরাণীরা বিনা পয়সায় রয়েছে যে তোমাকে সব সময়ে খাটতে হবে...

হাতের কাজ বন্ধ না করিয়াই কমলা বলিল, শুধু শুধুই ত বসে থাকি মা...

রাগিয়া মাতা বলিলেন, আমি কি আর বুঝি না বাছা তুমি চাও খেটে খেতে...কেমন না? তা নিজের পেটের মেয়ে ত নও!...

লজ্জিত ভাবে কমলা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের মেয়ে কি আমার চেয়ে বেশী ভালবাসা পেত...

—বয়ে গেছে তোকে ভালবাসতে। কবে চলে যাবি ঠিক নেই...বলিয়াই নিজেকে সামলাইয়া লইতে মুখ ফিরাইয়া ঝি ঝি বলিয়া জোরে ডাকিতে লাগিলেন!

দাসী আসিলেই রাগ করিয়া বলিলেন, তোমাদের এখানে পোষাবেনা বাছা। একরত্তি মেয়ে তাকে না খাটালে কাজ হয় না। তোমরা দেখছি বেশ বাবু হয়ে উঠেছ...

দাসী মুখ নত করিয়া বলিল, উনিইত কাজ করতে চান। আমরাই ত ওঁর হাত থেকে কাজ কেড়ে নি।—

কাজ ত কেড়ে নিস কিন্তু যত্ন আত্তিটাত দেখান উচি[illegible] বাপু? এইত একটা দিন বাড়ীতে ছিলুম না এসে দেখ

কতকগুলো ঠাণ্ডা ভাত নিয়ে বসেছে, কৈ—বারণত করতে পারিসনি কেউ, ঝি নীরবে চলিয়া গেল।

কমলা মাতার কাছে আসিয়া বলিল,—এ তোমার মিছে রাগ মা, অতটা সাবধানী হয়ে আমি চলতে পারি নে।

—মায়ের মন ছেলের বিপদের আশঙ্কায় সব সময় কত ব্যস্ত থাকে জানতে পারলে তুই এত অসাবধানী হতিস নে। ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে আমাকে বিপদগ্রস্ত করতে সাহস করতিস নে!

লজ্জিত হইয়া কমলা কথাটাকে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা তুমি যে সে দিন বললে, দাদাকে বাড়ী আসতে লিখেছ, কই তিনি ত এলেন না? ভুলে গেছ বুঝি?

—না মা ভুলিনি, সে বাড়ী আসতে চায় না।

কমলা উত্তর দিল, এবার বাড়ী এলে আমি তাকে এ সব বিষয় বুঝিয়ে বলব?

অজয়ের মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, না মা। তুই হঠাৎ কিছু বলতে গেলে সে যে ছেলে, হয়ত এক কথায় দশ কথা শুনিয়ে দেবে। মনে মনে তুই কষ্ট পাবি। অথচ মুখ ফুটেও আমায় বলবিনি।

হাসিয়া কমলা বলিল, যদি আমি কিছু গ্রাহ্যই না করি।

সে হাসিমাখা মুখখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিবার আগ্রহে মাতা বলিলেন, কেন তুই গায় পড়ে সইতে যাবি? কোন বিষয়ে তুই তার চেয়ে কম? বরং দরকার থাকে সেই তোর সঙ্গে আলাপ করে নেবে। তুই ছোট, এত তারই কাজ।

মায়ের মুখে এই পর পর ভাবের কথার কোন সঙ্গত অর্থ কমলা মনের ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। মুখ বিমর্ষ করিয়া ফেলিল।

কমলার মুখের ভাবে ব্যথিত হইয়া অজয়ের মাতা বলিলেন, দুঃখ করিসনে মা, ছেলের প্রতি এরূপ কথা কোনও মা সহজে উচ্চারণ করে না।

অভিমান ভরে কমলা বলিল, আমি তা শুনতে চাই নে।

—আমাকে ভুল বুঝিস্ না মা। আমারি দুর্ভাগ্য নতুবা পেটের ছেলে মাকে এতকাল ধরে গড়ে পিটে মানুষ করেছি, সেই আমাকে বুঝতে পারে না। অভিমান করে কলিকাতায় বসে থাকে। এত বড় একটা বাড়ীতে আমি একলা থাকি কি করে?

কমলা দুঃখভরে অজয়ের মাতার কোলের উপরে মাথা

রাখিয়া বলিল, আমি ছেলেমানুষ। আমায় মাপ কর, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পিঠের উপর সস্নেহে হাত দিয়া মাতা বলিলেন, তুই সামনে এসে আমার মনের ভিতর মস্ত বড় একটা আশা জাগিয়ে দিয়েছিস্। আলো,...চারিদিকে আলো...চারিদিক হেসে উঠছে। কিন্তু মেঘকে সরিয়ে দিতে হবে। বড় ভয় হয়...তুই আমার সহায় হ কমলা, তুই আমার সাথী হ।

মায়ের আশা, আকাঙ্খা সম্যক বুঝিতে না পারিলেও আজ এই বর্ষীয়সী নারীর নিকট কমলার মাথা নত হইয়া গেল। প্রবল স্নেহের আকর্ষণের নিকট সংসার অনভিজ্ঞা কোমল হৃদয়া বালিকা বশীভূত হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহার পা ছুঁইয়া বলিল, মা আমি কখনও তোমার কথার প্রতিবাদ করব না; যখনই যা আদেশ করবে, নিরুত্তরে তাই পালন করে যাব।

—না তা করতে হবে না। বুঝে নেবার চেষ্টা করবি, হয়ত সময় সময় সবকথা খুলে বলতে পারব না কিম্বা বলা সঙ্গত হবে না।

কমলা নিরুত্তরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুঃখিত মনে মাতা বলিতে লাগিলেন, বড় অভিমানী ছেলে সে,

তাকে নিয়ে আমাকে বড় সাবধানে চলতে হয়। এত দিনেও তাকে সংসারী করতে পারি নি। কতকগুলো ছাই ভস্ম বই পড়ে তার মাথা গুলিয়ে গেছে; সংসারেরওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। যখন বুঝতে পারবে, সুখের আশায় সংসারী হতে চাইবে তখন ভুল করবে না কে বলতে পারে! আর আমি হয়ত তখন তাকে পথ দেখাতে আর বেঁচে থাকব না! মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নয়।

কমলা, মাতার কথাগুলি সম্যক বুঝিতে পারিতেছিল না। এই অভাবহীন সুখের সংসারে এত সাবধানী হওয়া কি জন্য তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও হয়ত তখন তাহার জন্মেনি।

মাতা আস্তে আস্তে উঠিয়া বলিলেন, চল মা তোর থাকবার ঘরটা একবার দেখে আসি।

---

[৫]

কমলাকে সঙ্গে করিয়া অজয়ের মাতা কমলার থাকিবার ঘরে ঢুকিলেন। সাজানো গোছান না থাকিলেও ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। উত্তর দক্ষিণ খোলা ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অজয়ের মাতা তাহার নিজের দাসীকে জোরে ডাকিলেন।

দাসী নিকটেই ছিল, কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন বুড়বয়সে তোমার আর আক্কেল কবে হবে? ঘরটা একটু গুছিয়েও দিতে পার না? ও না হয় ছেলেমানুষী।

ভীতভাবে ঝি বলিল, দিদিমণি ত আমাকে এ বিষয় একটা মুখের কথা বলেন নি।

—ও ছেলেমানুষ, নাইবা বললে। বুঝে সুজে যদি কাজ করতে না পার, তা হলে এখানে পোষাবে না।

ঝি অনেক দিন এ বাড়ীতে আছে। গিন্নিমার নিকট এত খানি রূঢ় কথা আর কখনও শোনে নি। সে হতভম্ব হইয়া মাইজির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা তাহাকে আদেশ করিলেন, যাও, শীঘ্রই আমার ঘর থেকে দুর্গাপ্রতিমার বড় ছবিখানা নিয়ে এস। একটা চাকরকেও ডেকে নিয়ে এসো।

ছবি আনা হইলে দক্ষিণ দিকের দরজার উপর টাঙান হইল। উত্তর দিকের দরজার মাথা বড়ই ফাঁকাফাঁকা লাগিতে লাগিল। দুই একবার সে দিকে চাহিয়া ঝি বলিল, এখানে টাঙাব কি?

একটুখানি ভাবিয়া মাতা বলিলেন, আচ্ছা থাক। আর ত ভাল ছবি দেখছি নে। হঠাৎ মশারির দিকে দৃষ্টি পড়াতে বলিয়া উঠিলেন, এরূপ নোংরা মশারী লোকে কি ব্যবহার করতে পারে বলিয়া নিজের দেরাজের চাবীটা ঝিয়ের নিকট ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন যাও ভাল নেটের মশারিটা বার করে নিয়ে এসো।

কমলা এতক্ষণ অবাক হইয়া মাতার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল, এবার কথা না বলিয়া পারিল না, মা যে আমাকে একেবারে সৌখিন বাবু করে তুলছেন!

গম্ভীর ভাবে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া মাতা

বলিলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দোষের নয় বাছা। এতে আর সৌখিনত্বের কি আছে? চাকরাণীর মত থাকতে হবে নাকি?...কমলার মুখখানি ব্যথায় ভরিয়া গেল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাতা বলিলেন, তুই আমার মেয়ে; তোর ঘর এইরূপ সাদাসিদে ন্যাড়া নেংটা মোটেই ভাল দেখাবে না।

পার্শ্বস্থ চাকরকে আদেশ করিলেন, যা ত বাহিরের ঘর থেকে শ্বেতপাথরের টেবিলটা এনে ওখানে পাত। এ কোণটা ত মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না, এখানে কি রাখা যায় বলত?

সৌখীন চাকর উত্তর দিল, তে-পায়ার ওপর একটা ফুলদানী রেখে দিলে ভাল হয় না মা?

—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। কই মেয়ের বসবার জায়গার ত কোনও সুবিধা হল না? এ ঘরে আর জায়গাই বা কোথা? আচ্ছা পাশের কোণের ঘরটায় একটা ভাল দেখে চেয়ার ও টেবিল পাত ত।

চাকর সেইরূপ করিয়া বলিল, টেবিলের উপর কি রাখব?

কমলা নিজের ঘরের খানকয়েক বই দেখাইয়া দিল।

এই সব বই বুঝি তুই পড়িস? ততক্ষণে ঝিয়ের নূতন

মশারি টাঙান হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, দিদিমণি সময় পেলেই পড়েন।

—না বেশী পড়িস নে; বেশী পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যায়। বেশী পড়ে অজয়টা যে কি হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারি নে। আর এ কেমন দর্শনশাস্ত্র যাতে সংসার-ধর্ম্মের ওপর বীতরাগ এনে দেয়। ওগুলো ত সব পাগলের প্রলাপ। এ সব বাজে বই তোর পড়তে হবে না, বলিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিল, যে যা মনে ভাবে নিজের বইতে ত তাই লিখে রেখে যায়…

হর্ষোৎফুল্ল মনে অজয়ের মাতা বলিলেন, ঠিক বলেছিস মা। কতগুলো বাজে বই পড়ার চেয়ে আমার মতে রামায়ণ মহাভারত—পড়াই সবচেয়ে ভাল। তোর কাছে যদি না থাকে তবে আমি আনিয়ে দিচ্ছি, বলিয়া নিজের ঘরে থেকে ঐ সব বইগুলি আনতে আদেশ করলেন। একটু পরিশ্রান্ত হইয়া মাতা কমলার বিছানার উপর বসিলেন। কমলা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল!

কিছুক্ষণ ঘরের চারি পাশে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে মাতা বলিলেন, মাঝখানে এই খোলা জায়গাটা বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে। একটা কার্পেট পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাতো

নিবি। আর ওর পরে বসে লেখা পড়া করিস। কার্পেটটা বেশ দামী, আমি অনেক দিন যত্ন করে তুলে রেখেছি; তোরা···তুই বসে লেখাপড়া করবি বলে।

কমলা হাসিয়া বলিল, তুমি ত আগে আমায় চিনতে না মা? কেমন করে আমার জন্যে তুলে রাখলে?

ব্যস্ত হইয়া জোরের সহিত মাতা বলিলেন, চিনতুম, নিশ্চয় চিনতুম। বুড়ো হলে তুইও এমনি করে আপন মেয়েকে চিনতে পারবি। তার আগমনের আশায় কত জিনিষ তুলে রাখবি। আর তাদের হাতে তুলে দেবার সময় বুকটা ফুলে উঠবে। সে যে কি আনন্দ মা। তা মা না হলে বুঝতে পারা যায় না। এই দ্যাখ্, বলিয়া মাতা সজোরে কমলার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন।

সাবধানী মাতা তখনি বুছিতে পারিলেন, আর বলা যায় না। সে যে সুদূর আশা, এই দুর্গাপ্রতিমা, আর সেই শিবের ধনুর্ভঙ্গ পণ···যদি না হয়! না, হতেই হবে নতুবা কাশী যাবেন। সংসার গোল্লায় যাবে।

কমলা মায়ের কথা গুলিকে শুধু মায়ের স্নেহের আতিশয্য ধরিয়া লইয়া বলিল, বড্ড খেটেছ মা, চল যাই তোমার আহ্নিকের জায়গা করে দিগে।

—না একটু পরে যাব। ঐ জায়গাটায়—একটা ছবি ...অসুখ করলে ত তুই মাথা টিপে দিবি।

হাসিয়া কমলা বলিল, মাথা আমি এমনি টিপে দেব; তাই বলে তোমার অসুখ করে কাজ নাই তার পর মাতার হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিল, আর দেরী করোনা মা, চল।

মাতা উঠিতে উঠিতে একবার মেয়ের মুখের দিকে, আর একবার দরজার মাথায় সাদা জায়গাটার দিকে চাহিয়া ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা আমার ঘর থেকে অজয়ের তৈল চিত্রটা এনে এখানে টানিয়ে দে। বলিয়াই ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। কি ভাবিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল কথা, তোর কাপড় চোপড় গুলো ত দেখা হল না? আমার মেয়ে ত, শীঘ্রই শিখে নিবি; মনে মনে বলিলেন, যে ছেলে সে, আসবে বলে দুএক দিনের ভিতর কি·সে আসছে!—জোরে বলিলেন, কালকে তোর কাপড় চোপড় গুলো দেখব। আমি না দেখলে এখন তুই কোন বিষয়ে মনোযোগ দিস না, দেখতে পাচ্ছি...তবে চল—তুইই আজ আহ্নিকের জায়গা করে দিবি।

---

[৬]

কামিনী স্বামীর জন্য যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধন কার্য্য করিতেছিল, এমন সময়ে পাশের বাড়ীর ঠানদি তাহার নিকট তরকারী চাইতে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া' বলিলেন, কই এত সকালে ত তুই কোন দিন রান্না করিস নে। আজ এত তাড়াতাড়ি যে!

কামিনী দুটী তরকারী তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া লজ্জিতভাবে বলিল, আজ যে বাড়ীর কর্ত্তা এসেছেন। বেড়াতে গেছেন, তাঁর আসার আগে রান্নাটা শেষ করতে পারলে হয়।

ঠানদি চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, তোদের বুদ্ধি শুদ্ধি কবে হবে না?

কামিনী কোন দোষ করিয়াছে, মনে করিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি দোষ করেছি ঠানদি?

—দোষ বলে দোষ? এতদিন পরে [illegible]মাই বাড়ী এসেছে, আর তুই কিনা এই ময়লা কাপড় পরে এ[illegible] চুলে বসে আছিস্, কেন লো সে কি বাড়ীর চাকর?

কুণ্ঠিত ভাবে কামিনী বলিল, আমি কি তাই ভাবি।

—তবে এরকম চেহারায় রয়েছিস্ কেন? ভাত রাঁধা এখন থাক। চিরুণী ও চুলের কাটা নিয়ে আয়। মুখ মুছিয়ে চুলগুলো বেঁধে দিয়ে যাই, কপালমন্দ শাশুড়ীর যত্ন ত আর পেলি নে।

কামিনী ভয়ে ভয়ে বলিল, একদিন চুল না বাঁধলে কি দোষ হবে ঠানদি? এখন ত আর ফেলতে পারবে না।

—মনের ভিতর অত গরব রাখিস নে। শুধু রেঁধে ভাত দিলে আর পাদোদক খেলে স্বামীর মন ভোলে না; সে আরও কিছু চায়। পুরুষ সবচেয়ে রূপটাকে বেশী ভালবাসে। এতদিনেও তুই তা বুঝতে পারলি নে, বোকা মেয়ে। যা শিগ্‌গির আয়না চিরুণী নিয়ে আয়। এখনও আলো আছে। এরপর আর চোখে দেখতে পাব না।

ঠানদিদির কথা অবহেলা করিতে কামিনী সা[illegible] করিল না। তাঁহাকে বসিবার আসন দিয়া ভাত

নামাইয়া রাখিয়া আসিল। আয়না চিরুণী ও চুলের দড়ী লইয়া কামিনী ঠানদিদির সম্মুখে বসিল।

তিনি অঙ্গ প্রসাধনের দ্রব্যাদি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এতবড় চাকরের বউ তুই...না আছে একটু গন্ধ তেল, না আছে একটু পমেটম, এ সব চাইতে পারিস নে ?

কামিনী বলিল, গৃহস্থের ঘরে শাঁখা, শাড়ী ও সিঁন্দুর পরতে পারলেই যথেষ্ট। ও সব বাহুল্য দ্রব্য কিনে পয়সা নষ্ট করার দরকার কি ?

হাসিয়া ঠানদি বলিলেন, আছে লো আছে একদিন বুঝতে পারবি। কথায় কথায় চুল বাঁধা শেষ হইয়া গেল কামিনীর মুখ মুছাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ঠানদি চলিয়া গেলেন।

* * •

তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করিয়া কামিনী স্বামীর খাবারের জায়গা করিয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে ভবেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভবেশ ভাত খাইতে খাইতে অন্যমনস্কভাবে বলিল, নরেনের দোকানখানা দেখছি বেশ বড় হয়ে পড়েছে।

কামিনী বলিল, হ্যাঁ, আমাদের ভূতো ঐ দোকান থেকে

জিনিষপত্র নিয়ে আসে। তবে নগদ পয়সা না হলে দিতে চায় না। কিন্তু গনেশ পালের দোকানে বাকী পাওয়া যায়।

ভবেশ জলের গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খাইয়া টক্ দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, হ্যাঁ বাকী না দিলে চলবে কেন? সব সময় ত সবার কাছে পয়সা থাকে না।

—ওকি উঠে পড়লে যে, বসো আমার মাথা খাও একটু বসো। একটু পায়স রেঁধেছি, খেয়ে যাও। গরম থাকবে বলে উনুনের পর রেখে দিয়েছি। এনে দিচ্ছি।

খাবার শেষ হইলে আসন ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে ভবেশ বলিল, তোমার খাওয়া হয় নি বুঝি?

কোন কথা না বলিয়া স্বামীকে হাত ধুইবার জল, বিছানার পাশে পান ও খাবার জল ঢাকিয়া রাখিয়া কামিনী রান্না ঘরের দিকে আসিল। একা বিছানায় শুইয়া ভবেশের কেবলি মনে পড়িতে লাগিল, অজয়ের মনের ভাব ও চিন্তার ধারা। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই অবিবাহিত যুবকেরা বিবাহিত জীবনের সুখ কল্পনা করিতে পারে না। শুধু ওর আঁধারের দিকটাই দেখতে পায় কিন্তু প্রেমের আলোতে আঁধার নেই। সব উজ্জল; বসন্তের আলো—মলয়ের হাওয়া—।

পান হাতে করিয়া কামিনী স্বামীকে জাগ্রত ও চিন্তামগ্ন দেখিতে পাইয়া বলিল, কাল ত সকালে আর চাকরী করতে যেতে হবে না, তবে এত ভাবছ কি ?

প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিতে হাস্যময়ী স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া ভবেশ বলিল, সবাই যদি আমার মত সুখী হত ! তোমার মত স্ত্রী পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা।

যাও, বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কামিনী মশারি ফেলিয়া বিছানার পার্শ্বে গুজিতে লাগিল। এক দৃষ্টে ভবেশ সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কামিনী ঘরের কোণে হ্যারিকেন নিবাইতে যাইতেছে বুঝিতে পারিয়া ভবেশ বলিল, না, আলোটা এখন নিবিয়ো না। কাছে এসো তোমার মুখ আজ দেখতে বড় সুন্দর লাগছে।

লজ্জায় মুখ নত করিয়া কামিনী বলিল, বিশ্রী হলেও ত আর ত্যাগ করতে পারবে না। শুধু পায়ে রাখলেই হয়।

—কেন কামিনী নিজেকে অত ছোট ভাবছ ? আমার মনে হচ্ছে কি জান, এইরূপ পাশাপাশি আমরা চিরকাল যদি বসে থাকতে পারতুম...

কামিনী স্বামীর পা দুখানি কোলের উপর লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল। ভবেশ স্ত্রীর একখানি হাত নিজের

হাতের ভিতর আনিয়া বলিল, শুধু আমরা দুজন। এই বিরাট পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার ভিতর শুধু ঐ মুখখানিই আমাকে জীবন্ত রেখেছে। একা তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

কামিনী হাসিয়া বলিল, তা থাকব বলেই ত আমি নারী হয়ে জন্মেছি।

—সব ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করতে পারবে? ভেঙে পড়বে না ত?

—না, বলিয়া কামিনী ভালবাসার আতিশয্যে আশ্রয়ের গর্বে ভবেশের হাত দু'খানি বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। কোনও কথা আর মুখ দিয়া বাহির হইল না। এ, এমনি স্থান—কি আরাম, কি শান্তি!

ভবেশ একখানি হাত ছাড়াইয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার ওপর রাখিয়া বলিল, আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমি তুমি—তুমি আমি। আর কেউ নাই! একবার তোমার সমস্ত মনের আশা আকাঙ্খা, প্রাণের অনুভূতি, রূপরস গন্ধ, সহানুভূতি আমাতে আসুক, আর একবার আমার যত কিছু সমস্ত তোমার মনের ভিতর দপ দপ করে জ্বলে উঠুক…হোক তাই হোক্।

কামিনীর স্বামীর বুকে মুখ লুকানো ছাড়া আর কথা

বলিবার ক্ষমতা ছিল না।—তখন নিশীথ রাত্রি চারিদিক নীরব, নিথর...।

অসুখ করবে যে ! ঘুমোও, বলিয়া কামিনী উঠিয়া জোর করিয়া আলো নিভাইয়া দিল।

* * * *

পরদিন সকালে পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। ভবেশ পত্র পড়িতে পড়িতে স্ত্রীর পার্শ্বে আসিয়া বলিল না আর কলকাতায় যেতে হবে না। আর আমরা ছাড়াছাড়ি হব না।

—কি হয়েছে ? খুলেই বল না ?

সাহেবের দস্তখত পত্র পেলাম। আমার চাকরী গিয়েছে, মাইনের টাকা কাল মণিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে। কি শালা এই বড় বাবু ? মুখে এক, মনে আর এক, ব্যাটা আমাকে চালাকী করে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে শেষে আমার এই সর্ব্বনাশটা করলে।

সান্ত্বনার সুরে কামিনী বলিল, ভেবে আর কি হবে। তুমি, আমি আর এই ছেলেটা ত ? একরকম করে চলেই যাবে।

মাদুরের উপর বসিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া হাতদুটা মাথার উপর রাখিয়া সামনের আকাশের দিকে চাহিতে

চাহিতে ভবেশ বলিল, না, আর চাকরী করব না। এর চেয়ে আলু পটল বেচা ভাল।

—বালাই আলু পটল বেচতে যাবে কেন? আমার গায়ে এখনও দুচারখানা গহনা আছে। তা বেঁচে সামান্য পুঁজিতে নরেনের মত একখানা দোকান করো। ওদের অতবড় সংসারটা চলছে, আর আমাদের তিনজনের চলবে না? মুড়ী বাতাসা আমি নিজেই তৈয়ারী করে দেবো।

—না তা করতে হবে না। দেখি ভগবান যদি মুখ তোলেন কোনরূপে চলে যাবে। ভগবানের ইচ্ছা কে জানতে পারে? জানি না, তাঁর মনে কি আছে।

দুজনে পরামর্শ করিয়া বড় রাস্তার পার্শ্বে একখানা চালা ঘর ভাড়া লইয়া ভবেশ মনোহারী, মুদীখানা ও মুড়ী মুড়কীর দোকান আরম্ভ করিয়া দিল।

---

[৭]

সেদিন সকাল বেলায় অজয়ের বাড়ীর সরকার মুটের মাথায় এক ঝুড়ি জিনিষ পত্র আনিয়া কমলার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঔৎসুক্যের সহিত কমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃদ্ধ সরকার একটী একটী করিয়া জিনিষ তাহার নিকটে সাজাইয়া রাখিয়া দ্রব্যগুলির অশেষ গুণগান করিতে করিতে বলিল, দিদিমণি, আমি পয়সার তোয়াক্কা রাখি নি। বাজারের সেরা জিনিষটী কিনে এনেছি। আর মা কর্ত্তা হুকুম দিয়েছেন, মেয়ের জন্য সব চেয়ে ভাল জিনিষ চাই; যত পয়সা লাগে।

অজ্ঞাত সারে কমলার মুখ দিয়া বাহির হইল, কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়েছে।

মুখ চোখ বিস্ফারিত করিয়া সরকার মহাশয় বলিল, বলেন কি দিদিমণি? এ সব জিনিষ কি কম দামে

পাওয়া যায়? আর জমিদার বাড়ীতে বাড়ীর সেরা জিনিষ না আনলে লোকেই বা বলবে কি?

ব্যথিত মুখে জিনিষ গুলির দিকে চাইতে চাইতে কমলা বলিল, এতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে যে।

—এই বাড়ীর গিন্নী মা যখন নতুন আসেন তখন এই সরকারই কর্ত্তার হুকুমে তাঁকে অনেক জিনিষ কিনে দিয়েছিল...সে কি দিন কালই গেছে!

—তিনি জমিদারের বধূ ছিলেন। কিন্তু আমি ত সরকার মশায় বড় লোক নই। এ সব জিনিষ মাখা আমার অভ্যাস নেই।

হাসিতে হাসিতে সরকার বলিল, আমরা চাকর বাকর, কি করে বুঝব।

বিরক্ত হইয়া কমলা বলিল, আপনি এগুলো নিয়ে যান। আমার এতে কোন দরকার নেই।

—সে হুকুম আমার প্রতি নেই যে দিদিমণি, আমায় মাপ করবেন বলিয়া সরকার ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ঘরের ভিতর চেয়ারে বসিয়া কমলা কত কি ভাবিতে লাগিল।

সরকার সুচতুর লোক। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে

পটু। কমলার ভাবগতিক দেখিয়া ভবিষ্যৎ গোলমাল নিবারণ করিতে তাহার ঝিকে সমস্ত বলিয়া কমলার কাছে পাঠাইয়া দিতে ভুলিত না।

ঝি ঘরে ঢুকিয়া কমলার অবস্থা দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল।

কমলার প্রতি স্নেহের তাড়না, তাহার ভবিষ্যৎ সুখের আশা ও আকাঙ্খা ঝিয়ের মনে কেবলই ধাক্কা দিতে লাগিল। পাশে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, দিদিমণি ওগুলো রাস্তায় পড়ে রয়েছে। এই ত আমার পা লেগে ভেঙে যাচ্ছিল, কোথায় তুলে রাখব?

পুস্তকের দিকে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া কমলা কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। কোন উত্তর দিল না।

একটুখানি পরে আবার ঝি বলিল, বুড়মানুষ চোখে দেখিনি। এখনি ত ভেঙে ফেলছিলুম। কোথায় রাখব বল না? আহা কি খাসা গন্ধ। বাপের জন্মে ত এমন জিনিষ পত্র দেখি নি।

কমলা সুপ্তোত্থিতের মত মুখ তুলিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল, তোকে না দিদিমণি ও জামাইবাবুর খবর নিতে বলেছিলাম!...বাড়ীর ঘর দোর গুলো ঐ ভাবে পড়ে থাকুক; একবার তুই তাও ভাবিস নে।

ব্যস্ত ভাবে ঝি বলিল, দিদিমণি—জামাই বাবুর ঠিকানা ত আমি জানি নে। তোকে এখানে একলা ফেলে শুধু গাঁয়ে যেতে মনও সরছে না। কোথায় কর্ত্তাবাবু, গিন্নী মা, বলিয়া ঝি আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

কোন কথা না বলিয়া নিজহস্তে কমলা বহুমূল্য সাবান এসেন্স ও তেলগুলি আনিয়া দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিল। চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া কমলা মনে মনে বলিল, যাক্ সে অতীত চিন্তা—স্রোতে গা ভাসিয়ে দি, দেখা যাক্, শেষ কোথায়...।

পাশে তখনও ঝি আঁচোলে চোখ মুছিতেছিল। কমলা তাহার কোলের কাছে বসিয়া বলিল, কাঁদিস নে, তুই কাঁদিলে আমি স্থির থাকতে পারি নে।

ঝি শক্ত হইয়া কমলাকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, নিজের অযত্ন করে দেখত গায়ে কত ময়লা জন্মিয়েছিস্। বড় লোকের বাড়ী থাকতে হলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়।

কমলা ঝিয়ের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই কি ভুলে যাচ্ছিস, দুমাস আগে আমার বাপ মা মারা গেছেন!

কমলাকে বুকের ভিতর জোরে চাপিয়া ধরিয়া ঝি বলিল, কিচ্ছু ভুলি নি দিদিমনি, সব একটী একটী করে মনের ভিতর গাঁথা আছে। তোর মা আমার শত্রু ছিল।

একটু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ঝি বলিল, বামুনের মেয়ে ডাগর ডোগর হয়েছিস্। তোর একটা গতি করতে হবে—সেই ভাবনা। কি সম্বল আছে আমার মনে ভাব কত্ত বড় দায়িত্ব...লক্ষীটী কথা শোন।

কমলা নীরবে ঝিয়ের বুকে মুখ লুকাইয়া রহিল। বুদ্ধিমতী বালিকা ঝিয়ের কথা সবই বুঝিতে পারিতেছিল কিন্তু সদ্য পিতৃ মাতৃ হারা বালিকার মন তখন অতীতের কথা ভাবিতেছিল; সে যেন বাড়ীতে রোগগ্রস্ত পিতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সেই আলো, সেই বাতাস, সেই ঘরখানি ঐ তার সম্মুখে—

কিন্তু প্রাণের কথা বলিয়া শান্তনা পাইবার লোক নাই। বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া বালিকা নিজেকেই নিজে শান্তনা দিতেছিল। ঝি সময় পাইয়া একটু শক্ত হইয়া কমলার গায়ের ময়লা ডলিতে ডলিতে বলিল, চল, আজ একটু সাবান মাখিয়ে দিগে।

যা ভাল বুঝিস কর, বলিয়া কমলা চুপ করিল।

—০—

[৮]

অজয় বাড়ী আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিতেই, তিনি বলিলেন, এতদিন পরে মাকে মনে পড়ল বাবা। হারে আজকাল চিঠি লিখলে উত্তর দিতে দেরী করিস কেন?

লজ্জিত ভাবে অজয় উত্তর দিল, পড়াশুনার গণ্ডগোলের ভিতর হয়ত দুই একদিন দেরী হতে পারে...উত্তর দিতে কি বেশী দেরী করেছি মা?

হাসিতে হাসিতে মা বলিলেন, মায়ের মন কিনা? বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলে পেলে হলে বুঝতে পারবি!

অন্য কথা তুলিতে অজয় বলিল, আমার ঘরের সুমুখের ঘরে কে এসেছে মা?

মাতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সদ্বংশের সুন্দরী সুশীলা এক মেয়ে খুঁজে পেয়েছি। বাড়ীতে একা একা থাকতে বড় কষ্ট লাগে। তুই ত সব সময় বিদেশে পড়ে থাকিস।

—লেখাপড়া শেষ না হলে বাড়ী আসি কি করে? শেষে লোকে তোমার ছেলেকে গণ্ডমূর্খ বলবে।

হাসিয়া মাতা বলিলেন, মূর্খ কেউ বলবে না, সে আমি বেশ জানি। তবে মা হয়ে আমি তোর জ্ঞানতৃষ্ণায় বাধা দিতে চাই না। বড়ই ভয় হয় বাবা, পাছে তুই আমাকে ভুলে যাস্।

—সত্যি মা। লেখা পড়া করতে করতে আমার মনে হয়, সব ভুলে আমি দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে বসে থাকি। মহান পুরুষদের বিরাট চিন্তাশীলতার মধ্যে কি অমূল্য বস্তু লুকান রয়েছে খুঁজে বের করি।…

গম্ভীর ভাবে মাতা বলিলেন, সংসারে যারা থাকে তাদের সাংসারিক জ্ঞান সব চেয়ে বড় হওয়া উচিত। তুমি নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করতে পার সে আরও ভাল, কিন্তু যারা সংসারের খারাপ দিকটা দেখে বেড়াচ্ছে আমি তাদের মনকে বড় বলে স্বীকার করতে চাইনে।

উত্তেজিত হইয়া অজয় বলিল, কামিনী কাঞ্চন অশেষ দোষের নয় মা?

হাসিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মাতা বলিলেন, কাঞ্চন জড়পদার্থ আর আমাদের দেশের কামিনীরাও ত ওরই সামিল। তাদের নিজের কি দোষ গুণ থাকতে পারে? তাদের ক্ষমতাই বা কি?—

—না মা, বড় বড় মনীষীগণ বলে গেছেন, কামিনীকাঞ্চন থেকে সব সময় দূরে থাকবে। তারা যত অনর্থের মূল।

মাতা ছেলেকে বুঝাইতে বলিলেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে, সংসার ধ্বংসকারী, ভণ্ডতপস্বীরা এ কথা বলতে পারে, কারণ তারা দুর্ব্বল চিত্ত স্বার্থপর।

মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিয়া অজয় কোন দিনই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তর্ক করিয়া হার মানিলেও তাহার মন হার মানিতে চাহিত না। উঠিবার ভাব দেখাইতে লাগিল।

মাতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, না এ ঠিক কথা নয় অজয়, দয়া মায়া, দাক্ষিণ্য মেয়েদের চার পাশে গড়ে ওঠে। আর টাকা দিয়ে কত লোকের কত উপকার করা যায়। ব্যবহারেই গুণগুলো ফুটে ওঠে। তবে নির্লিপ্ত হয়ে চল—সে ত ভাল কথা। ঘৃণা করা নিশ্চয় দোষের—ওগুলো সত্যি দোষের হলে এতদিন সংসার ভেঙ্গে পড়ত।

অজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তর্ক করে ত আমি তোমার সঙ্গে কোন দিন পেরে উঠিনি মা, এবং এ তর্ক করিবার জিনিষও নয়।

যা হোক্, চল তোকে খেতে দিগে।

খাবার দিতে দিতে পাশে বসিয়া মাতা বলিলেন, খাওয়া হলে চল, আমার মেয়ের সঙ্গে তোর আলাপ করে দেবো।

অজয়ের মুখে বিশেষ সন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইল না। মাতা উহা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত হইলেন। মনোভাব গোপন করিয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া কমলার ঘরে ঢুকিলেন।

কমলা এক মনে বই পড়িতেছিল। মাতা পুত্রকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজয়কে দেখাইয়া মাতা কমলাকে বলিলেন, এই আমার ছেলে অজয়, যার কথা তোকে বলেছিলাম কমলা। তার পর অজয়কে বলিলেন, এই আমার শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েটী। আলাপ করলে বুঝতে পারবি, কত সরল উদার মন এর।

অজয় মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; লজ্জার ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া কমলা বলিল, আজই এসেছেন বুঝি?

মুখের দিকে চাহিয়া অজয় উত্তর দিল, হাঁ।

—তোরা আলাপ কর, আমি আসছি। আজ একটু

ভাল করে খাবার দাবার জোগাড় করতে হবে, বলিয়া মাতা গৃহ ত্যাগ করিলেন।

বাধ্য হইয়া ভদ্রতার খাতিরে অজয় বলিল, ওটা কি বই পড়ছিলেন!

লজ্জিত মুখে কমলা উত্তর দিল, গীতা।

হঠাৎ অজয়ের দৃষ্টি কমলার উপর পড়িল।—এত সুন্দর …মনে ভাবিল, নারী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কি কঠিন।‥ কতরূপেই তোমরা পুরুষকে ভোলাতে পার, শেষে ‥

অজয় তাড়াতাড়ি অনেক কাজ আছে বলিয়া পলাইয়া গেল! কমলা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বই-এর দিকে চাহিয়া রহিল। ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্ম কোনটা শ্রেষ্ঠ? তাহার মাথার ভিতর নানা কথা তখন আসিতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে কমলার অনেক সময় কাটিয়া গেল।

হঠাৎ অজয়ের মার মনে পড়িল, ছেলের আজ জন্মদিন; কি খাইতে চায় শুনিয়া আসা হয়নি ত। তিনি পুনরায় কমলার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, অজয় সেখানে নাই?

বিস্মিত হইয়া কমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অজয় কোথায়?

—তখনই বেরিয়ে গেছেন।

বিরক্ত হইয়া মাতা বলিলেন, তুই বাধা দিলি না কেন? সব সময় ত বাইরে বাইরে থাকে, একটুও কি ঘরে থাকতে পারে না?

কমলা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া মনে ভাবিল, এ-কি আদেশ—বোধ হয় স্নেহের আধিক্যে মায়ের মনে হইতেছে না কি অধিকারে সে অজয় বাবুর কাজে বাধা দেবে। তথাপি স্নেহপ্রবণ মায়ের মনে আঘাত করিবার প্রবৃত্তি না থাকাতে বলিল, কি একটা জরুরী কাজ আছে বলে চলে গেলেন।

মাতা বিরক্ত ভাবে বলিলেন, তার কাজের মূল্য নেই। সে পালাতে চায়, সংসার ছেড়ে দূরে থাকতে চায়।—যাক্ গে। আমারই কি···তুই বাধা দিবি।...

কমলা হাঁ করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

---

[৯]

বামুন ঠাকরুণ ইতিমধ্যে অজয়ের মাতার নিকট দুই দুইবার কি রাঁধিতে হইবে শুনিতে আসিয়া ভৎ র্সিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ক্রমেই বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া প্রিয় ঝি কর্ত্রীমার কাছে আসিয়া বলিল, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আর কি কি রাঁধতে হবে মা?

অন্যমনস্ক ভাবে মাতা বলিলেন, ছেলেটা গেল কোথায়? সেই যে বেরিয়ে, গেছে; এখনও ত তার দেখা নেই?

—সারা গাঁ খুঁজে এলুম, কোথাও ত দেখা পেলুম না।

—সে বাড়ীতে থাকতে কলকাতা ছেড়ে আসে না।

ঝি কাতর মুখে কর্ত্রীমায়ের হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চোখ পড়াতে মাতা বলিলেন কমলাকে ডাক ত?

কমলা আসিলে মাতা বলিলেন, লজ্জা করিস নে মা। কি খেতে ভাল বাসিস, বল ত ?

লজ্জিত ভাবে কমলা উত্তর দিল তুমি যা খেতে বল।

—আমি কি তাই বলছি ? তোর কি খেতে ইচ্ছা হয় বল ?

কমলা কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না হঠাৎ মনে পড়িতেই বলিল, দাদা কি খেতে ভালবাসেন বল না মা ?

—ছোটকালে ত মাগুর মাছ খেতে ভাল বাসত। এখন ত আর ছোটটী নেই, কি খেতে ভালবাসে না বাসে আমি কি করে জানব ? কলকাতায় থাকে···কেই বা খাওয়া দাওয়ার যত্ন করে।

কমলা ঝিয়ের পানে তাকাইয়া বলিল, তা হলে আজ বামুন ঠাকুরকে মাগুর মাছই রাঁধতে বলগে ; বেলা হয়ে যাচ্ছে।

—তাতে তার কি ? বেলার দিকে কি তার লক্ষ্য আছে। খাওয়া দাওয়ার দিকে একটুও লক্ষ্য নাই। শরীর-টাকে একদম নষ্ট করে ফেলছে।

* * * *

আহারের পর অজয় মাতার নিকট বিশ্রাম করিতে আসিল।

মাতা বলিলেন, সব সময় যে বাইরে বাইরে বেড়াস্, কয় দিনের জন্য বা বাড়ী এসেছিস্? জমিদারীর কাগজপত্র গুলো কি একবার দেখতে পারিস নে? আমি যে চিরদিন দেখব, তারই বা কি মানে আছে?

বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া অজয় উত্তর দিল, ওগুলো আমার ভাল লাগে না মা। তুমিত এখন দেখছ।

—আমি পার্‌ব না; আমার বুঝি আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে হবে না?

অন্যমনস্ক ভাবে অজয় বলিল, বেশ ত দেওয়ানজী ত আছেন। তিনিই দেখবেন।—

—তা হলেই তুই জমিদারী রেখেছিস? পরের ওপর ভার দিলে সব দুদিনে উড়ে যায়।

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অজয় বলিল, দেওয়ানজী কি বিশ্বাসী নয়? অনেক দিন ত আছেন।

—আমি বুঝি সেই কথা বলছি? চোখ না রাখলে বিশ্বাসী লোকও শেষে অবিশ্বাসী হয়ে দাঁড়ায়।

ভাবিতে ভাবিতে অজয় বলিল, ঐ জন্যই ত মা আমি বলি, বিষয় বিষম বিষ, লোককে সয়তান করে তোলে।

মা ভাবিত হইলেন। বিরক্তির সহিত ব[illegible]লেন এই বংশের সুপবিত্র নাম দেখছি তুই রাখতে পারবি নে,

সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে পথের ফকির হবি। বেশ যা ইচ্ছা তাই করগে, আমি বা ক'দিন আছি।

মায়ের কাছে তাড়া খাইয়া, অজয় পলাইয়া গেল। মাতা বারণ করিলেন না; শুধু মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মন ঠিক করিয়া মাতা কমলার ঘরে উঠিয়া গেলেন।

অসময়ে মাকে আসিতে দেখিয়া কমলা সসম্ভ্রমে পাশে আসিয়া বসিল।

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার একটা কথা রাখতে পারবি?

মাতা এমন কি আদেশ করিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া কমলা নীরব রইল।

—পারবি ত?

মায়ের সব আদেশ পালন করিতে পারে মনে করিয়া কমলা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল।

মাতা বলিতে লাগিলেন, জমিদারী কাজ কর্ম্মগুলি দেখতে যেয়ে আমার আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম হচ্ছে না। আজ থেকে দেওয়ানজীকে বলে দেব, তুই কাগজপত্রগুলো দেখিস। আমার নেহাৎ সইএর দরকার হলে, তুই-ই

আমার কাছে নিয়ে আসবি, আর কাউকে আসতে হবে না।

কিন্তু জমিদারী কাজের সে কিছুই বোঝে না—একথা মাতা কেন বুঝিতেছেন না, তাহা কমলা বুঝিতে পারিতেছিল না। এ আদেশ পালন করিবার তার ক্ষমতা কোথায়? ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি ত কখনও জমিদারী কাজকর্ম্ম জানিনে, মা।

—নাজানিস্ শিখে নিবি। বুদ্ধিমতী আছিস, পারবি। যেটা না বুঝতে পারিস, প্রথম প্রথম আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিস্।

কমলা মনে ভাবিতে পারিল না, কেন অজয় বাবু থাকতে তাহার প্রতি এই কঠোর আদেশ। কি অপরাধ করেছেন তিনি, যাতে এই মাতৃপ্রবণ হৃদয় তাহার প্রতি সদয় থাকছে না। না এ হতে পারে না, কোন অধিকারে সে আজ পুত্রের প্রাপ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। এ নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ী। মনে জোর আনিয়া বলিল, যে কয়দিন দাদাবাবু এখানে আছেন সে কয়দিন তিনিই দেখুন না মা?

—সে হতভাগার কি আর সে ক্ষমতা আছে। কতকগুলো ছাই ভষ্ম বই পড়ে তার মাথা বিগড়ে গেছে। কুক্ষণেই তাকে দর্শন শাস্ত্র পড়তে দিছলুম। তখন মনে

ভাবি নি, ঐ শাস্ত্রগুলো ভাঙতেই জানে, গড়তে জানে না। কতকগুলো নিরলস লোক বনের ভিতর বসে যা মনে এসেছে তাই লিখে গেছে। পিতাপুত্র, ভাইবোন, দয়ামায়া, তাদের চতুর্দ্দিকে গড়ে উঠেনি। সমাজের বালাইত তারা কোনদিন পোয়ায় নি।

সহসা কণ্ঠ ভার করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা কমলা, এই প্রজাগুলি আমার ছেলেরও অধিক। অনেক পুরুষ ধরে এই বংশের অধীনে তারা সুখ শান্তিতে বাস করছে। পূজনায় শ্বশুর মশায় ভয়ে ভয়ে মৃত্যু সময়ে আমারি হাতে সম্পত্তি তুলে দিয়ে যান। যদি অজয়ের অক্ষমতায় এর কোন একটা প্রজা আমাদের কর্ম্মচারী কর্তৃক কিংবা অপর কারুর দ্বারা অত্যাচারগ্রস্ত হয় তবে তিনি স্বর্গেও চোখের জলে বুক ভাসাবেন, এ আমি সহ্য করতে পারব না। কিন্তু আমি ত চিরস্থায়ী নয় মা, একজনের হাতে এই সম্পত্তি আমাকে তুলে দিয়ে যেতেই হবে।

মায়ের কথাগুলি কমলা কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিল কিন্তু যার ন্যায্য সম্পত্তি তার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ঘোষণা নারীর কর্তব্য নয়। উত্তেজিত মাতাকে এখন বুঝাইতে যাওয়াও শক্ত। সময়ে মাতার পুত্রের প্রতি বিরাগ কমিয়া যাইবে। এখন তাহার কঠোর কর্তব্য অজয়বাবুকে

সব বুঝাইয়া বলা ; মায়ের কথা মত চলিবার জন্য অনুরোধ করা। সে কর্ত্তব্য সে যথা সাধ্য পালন করিবে মনে মনে ঠিক করিয়া কমলা তখনকার জন্য মায়ের কথামত চলিতে স্বীকার করিল।

মাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন।

---

[১০]

স্নানাগারে বহুমূল্য সাবানে ও সুবাসিত জলে কমলাকে স্নান করাইতে করাইতে ঝি আপন মনে বলিয়া উঠিল, বরাতে কি আছে জানি না, আবার বোধ হয় বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

নিজ হস্তে সাবানটাকে দূরে রাখিয়া, কমলা ঝিয়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,—হঠাৎ এ কথা বললি যে?—

—তুই এত বড় হয়েছিস্। ছেলেও বাড়ী এসেছে। বে'র কথা ত একবারও কেউ তোলে না। এদের মতলবটা ত বুঝতে পারছি না।

অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে ভাবিতে কমলা বলিল, একবার যখন স্রোতে গা ভাসান গেছে, তখন আর ছটফট করে লাভ কি? মনটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আর টানতে গিয়ে লাভ নেই।

কমলার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঝি গা মুছাইতে মুছাইতে বলিল, এত বড় মেয়ে, অবিবাহিত অবস্থায় পরের বাড়ী কতদিন রাখা যায়?

কমলা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে উত্তর দিল পরের বাড়ী? না দিদি তুই গিন্নিমাকে ভুল বুঝিস নে। সেই স্নেহশীলা নারী তিনি তার শত সহস্র স্নেহের উদাহরণ দিয়ে আমায় বাঁধতে চেষ্টা করছেন।

—ছেলেমানুষ তুই, সংসারকে চিনতে পারিস নি। আমি বুঝতে পারছি নে এত যত্ন, আদরের ভিতর তার কি উদ্দেশ্য আছে? একটা উদ্দেশ্যই ত আমি মনের ভিতর আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু কই, সে সম্বন্ধেও ত কোন উচ্চবাচ্য হচ্ছে না। আর এটা কি এত বড় আশা? আমরা পথের কাঙাল নই। এ সুন্দর রূপ কেউ না কেউ যত্ন করে ঘরে তুলে নেবে।

ততক্ষণে কমলা কাপড় চোপড় ছাড়িয়া সজ্জিত হইল। বেশ ভূষায় সে অপরূপ সৌন্দর্য্যে উছলিয়া উঠিতেছিল। কোথাও খুঁদ নাই। কমলা ঝিয়ের কথায়, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

ঝি তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আজ একটা কথা পাকাপাকি করতে হবে। আর কতদিন এ ভাবে থাকা যায়।

—আমি যার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি, তার কথামত চলব। তার মাতৃস্নেহের নিকট আমাকে ধরা দিতে হয়েছে। এমন নিস্বার্থ ভালবাসা, অকৃত্রিম ব্যবহার আমি পাই নি, তিনি দেবী।

—আচ্ছা দেখি কতদূর কি হয় বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঝি উপরে উঠিয়া গেল।

কমলা নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়াশুনা করিতেছে এমন সময় অজয় আসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি আমায় ডেকেছ? মা পাঠিয়ে দিলেন।

কমলা অজয়ের মুখের দিকে চাইল। অজয় দেখিল এত রূপ ?

কমলা স্পষ্ট ভাবে বলিল, এমন মায়ের মনে ব্যথা দিয়ে কি পৌরুষ বাড়ে অজয় বাবু ?

অজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কিসে ব্যথা দিলাম ?

—যাক সেও ভাল,যে আপনি জেনে শুনে আঘাত দেন নি।

অজয় স্পষ্ট ভাবে বলিল, তর্ক করিলে বুঝি মায়ের মনে আঘাত দেওয়া হয়। আর মাতা পুত্রে যে সব বিষয়ে একমত হতে পারব, তারই বা নিশ্চয়তা কি ?

—কমলা বলিল, বড় বড় বিষয় গরমিল হলেই ত গোলমাল বাধে।

—অজয় বলিল, স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে যদি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করি, তুমি আমায় মাপ করো। তোমাকে বোঝাতে হলে এখন আমাকে অনেক কথা বলতে হবে।

কমলা সরল ভাবেই বলিল, আপনি আমাকে তত ছোট ভাবছেন কেন? আমি বড় হয়েছি, আমার এটা বেশ বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে। কিন্তু সাবধান অজয় বাবু, আমি আপনার মাতৃস্নেহ কেড়ে নিচ্ছি; পরে আমার দোষ দেবেন না।

হাসিয়া অজয় বলিল, আমি এতে বরং সুখী; মায়ের সঙ্গী পাওয়ায় বরং আমি দূরে থাকবার সুবিধা পাচ্ছি। মা আমাকে বিষয় আশয়ের ভিতর ডুবে থেকে ঘোর স্বার্থপর সংসারী করতে চান, প্রজার নিকট হতে টাকা আদায় করতে বলেন। তা আমি পারব না। ও সব আমার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। আমি চাই উন্নতি—আত্মার দেহের মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি।

কমলা ভাবিতে ভাবিতে বলিল, বিষয় কর্ম্ম দেখলে কি উন্নতি হয় না,—

জোরের সহিত অজয় উত্তর দিল, না। তুমি কি জান না যে জমিদারী চালাতে হলে মামলা মকদ্দমা, আত্ম-

কলহ অঙ্গের ভূষণ করে নিতে হয়,—মনটা কত নীচ হয়ে পড়ে!

কমলা নিজের মনে ইহার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিতে পারিল না। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মা আর কিছু বলেন না?

উত্তেজিত অজয় বলিল, বলেন বই কি? বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু তার ফল কি জানো। ছেলে মেয়ের অত্যাচার, বউএর আবদার সব সইতে হবে। আজ এর অসুখ, কাল ওর মৃত্যু, সব চোখের সামনে দেখতে হবে। কি জন্যে এ সব সহ্য করব?

সরলভাবে কমলা বলিল, সমাজে বাস করতে হলে সবই সইতে হয়; আপনি চান সমাজে বাস করবেন, অথচ দায়িত্ব বইবেন না, এ ঠিক নয়। কেন সমাজ আপনাকে আশ্রয় দেবে? কিসের জোরে আপনি সে দাবী করেন?

উত্তেজিত ভাবে কমলা বলিয়া যাইতে লাগিল, এ বংশের আপনিই একমাত্র ছেলে, অনেকগুলি প্রজার বাপ মা হয়ে জন্মেছেন। তাদের সুখ স্বচ্ছন্দ আপনার উপর নির্ভর করছে, সে দায়িত্ব আপনাকে বইতেই হবে। নতুবা আপনি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করবেন। যদি আপনার কোন প্রজা, কোনদিন অত্যাচার গ্রস্ত হয়, সে পাপের ভাগ আপনার।

অজয় ভাবিতে লাগিল। তখন কমলার মুখশ্রী তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এই রূপ নিয়ে নারী পুরুষকে বশ করে ; তাদের হাতের পুতুল করে তোলে। কি বোকা তারা ? বিষয় বাসনা, অর্থের আকাঙ্ক্ষা — নারীর আনুসঙ্গিক পার্শ্বচর মাত্র...

অজয় সরিয়া যাইতে চায় কিন্তু পারিতেছিল না, কমলা চায় অজয়বাবুকে বুঝাইতে হইবে। মায়ের মনের দিকে চাহিয়া যে কোনরূপে হউক অজয়বাবুকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেই হইবে। কেন ? কেন ? ইনি স্নেহ-প্রবণা মাতার মনে অযথা কষ্ট দেবেন। উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, পিতামাতার ছেলে হয়ে আপনি কোন অধিকারে পিতামাতার দায়িত্ব বইবেন না ? শৈশব হতে যে স্নেহের দান আপনি পেয়ে এসেছেন, যে কষ্ট ব্যাকুলতা বা আগ্রহের ভিতর দিয়ে আপনার মাতাপিতা আপনাকে গড়ে তুলেছেন বেশী না হলেও ঠিক ততখানি আগ্রহ ও যত্ন দিয়ে আপনি আপনার ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে বাধ্য। সেই স্নেহের সিঞ্চনে আপনি আপনার ছেলেমেয়েকে সঞ্জীবিত করুন। পৃথিবীতে যে স্নেহের ধারা বয়ে যাচ্ছে, যে দয়া মায়া শান্তি দিয়ে সংসারের [illegible] গড়ে উঠছে, আপনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবেন না। সে

অধিকার আপনার নাই। সে ধারাকে ক্ষুন্ন হতে দেবেন না—তাকে বর্দ্ধিত করুন এবং সাগরের মত করে গড়ে তুলুন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, নীচভাব, স্বার্থ, ঝগড়াঝাটি সব দূরে চলে যাবে। অপার প্রেমের কাছে সবাই পরাভূত হবে। কামিনী কাঞ্চনের গুণ গুলিই ফুটে উঠবে। এ আপনার কাছে আমি আশা করি···এতগুলি কথা বললুম, মাপ করুন। আপনার বলে মা আমাকে আজ এ বাড়ীতে আশ্রয় দেছেন, তাই ভেবে যা ভাল বুঝেছি তাই বললুম। আপনি ভাবলে সুখী হব।

অজয় বলিল, তুমি এখন এখানে কিছুদিন আছ ত কমলা?

—জোর করে সে কথার উত্তর দেবার আমার ত কোন অধিকার নেই। স্নেহ-প্রবণা কোমল হৃদয়া, গরীয়সী আপনার মার অমায়িক ব্যবহারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি তার কথামত চলব। আরও বড় জোর গলায় তাকে বলেছিলুম, আপনাকে মায়ের কথা শুনতে অনুরোধ করব। এখন বুঝতে পারছি আমি বৃথা আস্ফালন করেছি মাত্র।

নারীর রূপ

কমলার সুন্দর তেজোদীপ্ত মুখের পানে অজয় চাহিয়া-ছিল। চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না। চোখের সাধারণ ধর্ম্ম সুন্দর জিনিষ দেখলে, তাকিয়ে থাকা। হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, মায়ের দেওয়া অধিকার তুমি যেমন স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারছ, আমি ত তা পারছি না। সময়ে দেখব, বলিয়া অজয় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

[১১]

লোকে চাকরী করিবার সময়ে ভাবে, তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না। তাই চাকরীর সময়টা ফাঁকি দিয়া কাটাইতে চায়, তাহাতে ক্রমে নিজেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য দেখা যায়, যখনই কোনও কর্ম্মচারী সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া ব্যবসা করিতে অগ্রসর হয়, নিজের অকর্ম্মণ্যতার দোষে শীঘ্রই অকৃতকার্য্য হয়। চাকরীতে প্রতিযোগিতা নাই তাই নিজের শক্তির মূল্য বুঝিতে পারে না। ব্যবসার ভীষণ প্রতিযোগিতার মাঝে আসিয়া পড়িলে, শিক্ষার অভাবে মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা রাজত্ব করে। মূলধন নষ্ট হইয়া যায়।

ভবেশ প্রথম প্রথম এইরূপ বিশৃঙ্খলতায় পড়িয়া ভাবিল, একজন ব্যবসাদার সঙ্গে লই। সুচতুর কৌশলী লোককে সঙ্গে লইয়া ভবেশ তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিল না। সে শীঘ্রই তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া. দোকানখানি গ্রাস করিতে লাগিল! কিছু দিন পরে হিসাব করিয়া দেখিতে পাইল, তাহার সমস্ত জিনিষপত্র বেচিয়া দোকানের দেনা শোধ হইতে পারে না; দোকানের অবস্থা জানিতে পারিয়া সমস্ত মহাজন একসঙ্গে আসিয়া তাহার নিকট টাকা চাহিয়া বসিল।

নিরুপায় ভবেশ রুক্ষসূক্ষ চুলে মাথায় করাঘাত করিতে করিতে বাড়ীতে ছুটিয়া আসিল।

তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কামিনী বলিল, কি হয়েছে ?...

ধপাস্ করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া ভবেশ এক গ্লাস জল খাইয়া মাথার চুল টানিতে টানিতে বলিল, সমস্ত মহাজনের টাকা আজই দিতে না পারলে আমাকে জেলে যেতে হবে; মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে।

কামিনী মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল ও স্বামীকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভবেশ কামিনীর হাত হইতে জোরে

পাখাখানা টানিয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর পাখার বাতাস করে সোহাগ করাতে হবে না—তোদের জন্যইত আমার এ দশা হল···কেন বিয়ে বা করেছিলেম...

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া কামিনীর চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতে চায় কিন্তু স্বামীর সম্মুখে সে কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

সে কাতর মুখের পানে তীব্র দৃষ্টি করিয়া ভবেশ বলিল, কাঁদলে চলবে না, কিছু টাকা দিতে পার...নতুবা আজ আর আমার রক্ষে নাই।

কাতর মুখে, ভাঙ্গা গলায় কামিনী বলিল, আরত আমার কিছু নেই। সব গহনা কাপড় চোপড়ইত দিয়েছি।

ভবেশ চেঁচাইয়া বলিল, যত যোচ্চোর শালারা টাকা থাকলেই খোসামোদ করে মালপত্র দেয়! আর এখন সবাই এক সঙ্গে টাকা চায়! আগে বাবু বাবু বলত, আর এখন তুই মুই ছাড়া কথা বলে না। বিদেশী বণিকরা আমাদের সর্ব্বনাশ করলে, হায়রে টাকা? ভবেশের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কামিনী আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। বসিয়া পড়িয়া নীরবে স্বামীর পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

ততক্ষণ বাহিরে গোলমাল হইতেছিল। পাওনাদারেরা আসিয়া ভবেশ ভবেশ বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। ভবেশ জোর করিয়া মাথাটা চাপিয়া ধরিল। বাহিরে পাওনাদারেরা একসঙ্গে বলিতে লাগিল, টাকা নিয়ে শালা এখন মেয়ে মানুষের আঁচল ধরে আছে। টাকা ফেল, নতুবা বেইজ্জত হতে হবে।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কামিনী নিজেই বহির্বাটীতে পাগলের মত ছুটিয়া গেল। ঘরের ভিতর থেকে জোরে জোরে ভাঙ্গা গলায় বলিল, আপনারা দুদিন সবুর করুন। আমরা খেটে শোধ দেব।

একটী অল্প বয়স্ক মহাজন অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, শালা ন্যাকামি করছে। মেয়ে মানুষ পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের ঘুরাতে চায়। এই বসলুম টাকা না পেলে আর উঠছি না, দেখি কেমন করে বাড়ী থেকে বেরোয়। এবার দেখা পেলে ঘাড় ধরে পিটতে পিটতে টাকা আদায় করে নেবো।

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে জোরের সহিত বলিল, আমি আপনাদের মেয়ে, পায়ে পড়ছি, আজকের দিনটা রেহাই দিন।

এক বৃদ্ধ মহাজন জোরে বলিল, মা আপনি এখানে

কেন? টাকা আদায় করা আমাদের ব্যবসা, অনেকে এইরূপ না করলে টাকা দেয় না।

আর একজন মহাজন বলিয়া উঠিল, আজ আমরা চললুম দোকানে তালা দিয়ে এসেছি, দুদিনের ভিতর টাকা না পেলে সব বিক্রী করে নিয়ে যাব।

অন্য একটী মহাজন বলিল, ঠিক বলেছিস ভাই। শুধু তালা দিলে হবে না। একজনকে বসিয়ে রেখে যেতে হবে। আমরা সরে যাব, ওরাও তালা ভেঙ্গে জিনিষপত্র বেচে পৌটলা পুঁটলি নিয়ে সরে পড়বে। এ শালা বহুত বদমায়েস আছে।

কামিনী স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে পারিল না! ঘরের ভিতর অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

* * * সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে কামিনী দেখিল, মহাজনেরা চলিয়া গিয়াছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় ছুটিয়া স্বামীর নিকট আসিতেই, ভবেশ জোর গলায় বলিয়া উঠিল, পাজী নচ্ছার মাগী বাহিরে ঢঙ করাতে গিছলি? শুনল না তোর কথা তারা?

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া হতাশ্বাসে কামিনী বলিল, তারা চলে গেছে—

এমন ঘরেও বিয়ে করেছিলাম যে মান সম্ভ্রম আর

রইলো না। যত বদমায়েসের পায় ধরে সতীগিরি ফলাতে গেছে…

স্বামীর মাথায় গোলমাল হইতেছে মনে করিয়া অতি কাতর ভাবে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কামিনী বলিল, ওঠ, মুখহাত ধোবে চল।

কামিনীর মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই অনুতপ্ত হৃদয়ে বালকের মত ভবেশ উঠিয়া গিয়া মুখ হাত ধুইল।

শান্ত শিষ্টভাবে দাওয়ার উপর বসিয়া ভবেশ বলিল, দুটো টাকা পেলে এখনি কলকাতা যেতুম। দেখি যদি অজয়ের নিকট কোনও সাহায্য পাই।

কামিনী অজয়ের কথা অনেকবার শুনিয়াছে। সেই সহৃদয় লোকটী সাহায্য করিতে পারেন, মনে ভাবিল, কিন্তু যাইবার খরচ কোথায় পাবে!

কামিনীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভবেশ নিজ মনেই বলিল, তবে হেঁটেই যাই। এ অপমান আর সহ্য হয় না!

কামিনী উঠিয়া গিয়া লক্ষ্মীর সিঁদুর মাখা টাকাটি আনিয়া ভবেশের সম্মুখে রাখিল।

ভবেশ টাকার দিকে চাহিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে

বলিল, শেষে লক্ষ্মীও অন্তর্ধান হলেন। তা হবেনই ত!
সেইভাল…ভাত দাও, খেয়ে যাই।

আহারান্তে ভবেশ কলিকাতায় যাত্রা করিল। আর চালের অভাবে কামিনী অনাহারে রহিল।

… … … …

ভবেশ যখন কলিকাতায় পৌঁছিল, অজয় তখন সবে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। অজয় ভবেশের চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দোকানের কথা উত্থাপন করিয়া ভবেশ বলিল, বড়ই টানাটানি… পড়েছে তুমি দুশো টাকা না দিলে ত আর মান রাখা যায় না।

অজয় ভবেশকে বাড়ীর কথা সমস্ত খুলিয়া বলিয়া শীঘ্র বাড়ী হইতে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই জানাইল। ভবেশ অজয়ের হাত ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হাত এড়াইতে না পারিয়া অজয় বাক্স খুলিয়া একশ টাকা আনিয়া ভবেশকে দিয়া বলিল, আর আমার কাছে টাকা নেই।

ভবেশ কাতরমুখে অজয়ের হাত ধরিয়া বলিল, —এতে যে হবে না ভাই!

—আর কোথায় পাব ?

যে রূপেই পার যোগাড় করে দাও ভাই, নতুবা আমার বাড়ী যাওয়া হবে না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া অজয় তাহার বাড়ি চেন আংটী ভবেশকে দিয়া বলিল, এই আংটী বাঁধা দিয়ে কাজ এখন চালাও শীঘ্রই ছাড়িয়ে দিব।

এই সপ্তাহের ভিতর বেশ, বলিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেরী করা চলবে না। আজ যাই, আর একদিন আসব, বলিয়া অজয়ের কথার উত্তর শুনিবার পূর্বেই সে বাহির হইয়া গেল।

[১২]

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল কিন্তু অজয় ভবেশের কোন পত্র পাইল না। রোজই মনে ভাবিত, আজই ভবেশের পত্র পাইব কিন্তু পত্র আসিল না। মনে হইল, না ইহা কখনও হইতে পারে না, ভবেশের মত উন্নত চরিত্র লোক মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিতে পারে না। মেসের বন্ধুরাও তাহাকে নানাজনে নানা কথা বলিত। কেহ বলিত তাহার স্বভাব খারাপ ছিল, তাহাতে চাকরী গিয়াছে। কেহ বলিত তাহার শশুর বাড়ী ভবেশের বাড়ীর নিকট; সে জানিতে পারিয়াছে, ভবেশ এখন মদ খাইয়া সব উড়াইয়া দিতেছে।

অজয়ের মন ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। সে যে তাহার পিতার ব্যবহৃত ঘড়ি চেন আংটী বড়ই বিশ্বাস

করিয়া ভবেশের নিকট দিয়াছে। ঐ সমস্ত জিনিষ না লইয়া সে কিরূপে মায়ের সম্মুখে যাইবে? শেষে বাধ্য হইয়া ভবেশকে জোর তাগাদা দিয়া সমস্ত খুলিয়া পত্র লিখিল কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না। অজয় নিরুপায় হইয়া পড়িল।

এমন সময় কমলার লেখা একখানি পত্রে সে অবগত হইল, তাহার মাতার শরীর খারাপ হইতেছে। অজয় বিরক্ত হইয়া পুনরায় ভবেশকে পত্র লিখিল, যেন পত্র পাঠ মাত্র সে যেরূপে পারে জিনিষগুলি লইয়া অজয়ের সহিত দেখা করে কিন্তু তথাপি কোনও উত্তর আসিল না।

মেসের বন্ধুদের প্ররোচনায় অজয় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। সবাই তাহাকে পুলিশের সাহায্য লইতে বলিল। নালিস করিতে যাইয়া ভাবিতে ভাবিতে অজয় ভবেশের দেশে রওনা হইল।

অনেক খুঁজিয়া ভবেশের বাড়ী বাহির করিল। বাহিরের ঘর জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অজয় দুই তিনবার জোরে জোরে ভবেশের নাম ধরিয়া ডাকিল কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

অজয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। পাশের ঘরের দাওয়ায় এক বৃদ্ধা বসিয়া

ছিলেন, তিনি অজয়কে দেখিয়া কিছুই বলিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। অজয় জিজ্ঞাসা করিল, ভবেশ দা কোথায় ?

কাতর মুখে বৃদ্ধা বলিলেন, তিনি ডাক্তারের বাড়ী গেছেন। কারণ জানিতে অজয় জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

—তার একমাত্র ছেলে মৃত্যু শয্যায়—কাল থেকে কলেরা রোগে যমের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু সেই যে সকালে বাবু বেরিয়ে গেছেন আর এখনও তার দেখা নেই !

সহানুভূতিতে অজয়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে কোন বাধা না মানিয়া একদম ঘরের ভিতর যাইয়া ঢুকিল। ছিন্ন মাদুরের উপর স্যাঁৎসেঁতে ঘরে এক সুন্দর সপ্তম বর্ষীয় বালক জল জল করিয়া ছটফট্ করিতেছে। পার্শ্বে মাতা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কোনওরূপে ছেঁড়া কাথার সাহায্যে লজ্জা নিবারণ করিয়া একদৃষ্টে বালকের মুখের পানে চাহিয়া আছেন !

অজয় ঘরে ঢুকিয়াই বাহির হইয়া আসিল। রমণী দরজার আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। এ ভীষণ দৃশ্য অজয় আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে দাওয়ার পার্শ্বে উপবিষ্টা বৃদ্ধা রমণীর

কাছে যাইয়া জোরের সহিত বলিল, বল, বল, কি হয়েছে? ভবেশ দা কোথায়?

—এই যে আগে বললুম বাছা, তিনি বেরিয়ে গেছেন। তুমি বুঝি পাওনাদার,...তার ত আর কোনও জিনিষ নেই, যে বেঁচে দেনা শোধ করবে। এ সময়ও তাকে ধরতে এসেছ?

অজয়ের চক্ষুতে জল আসিল। কোনও কথা শুনিবার পূর্ব্বে সে একবার ছুটিয়া যাইয়া বালকের পানে চাহিল। বালক তাহার দিকে চাহিয়াই, কাতর কণ্ঠে জল জল করিতে লাগিল।

অজয় জোরের সহিত বলিল, আমায় লজ্জা করবেন না বৌদি। আমি ভবেশদার ভাই, আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ খোকাকে একটু দেখুন।

পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ডাক্তারের বাড়ী ভবেশদা গেছেন?

আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধা বলিল, টাকা কোথায় পাবে যে ডাক্তার আনবে? আমার কাছে চাচ্ছিল!

... ...

—ডাক্তার আনতে যায় নি?

—না,

—তুমি একটু বস আমি দেখি যদি কোনও ডাক্তারকে পাই, এখনও যদি একে বাঁচাতে পারি। হায় কি দোষ করেছে ঐ ননীর পুতুল···মা হয়ে তার এই মৃত্যু—কেমন করে দেখছ···যাই বলিয়া পাগলের মত অজয় বাহির হইয়া গেল।

সামনে যাকে পাইল তাকেই জিজ্ঞাসা করিল, বাজার কোন দিকে? সে ছুটিতেছে, কোথায় কতদূরে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। কত সময় অতীত হইল জানিতে পারিল না। ঐ না দোকান—হ্যাঁ? নিশ্চয়। অজয় পকেটে হাত দিল, টাকা নাই; বসিয়া পড়িল। ওগো পথিক...বলতে পারো সেকরার দোকান কোথায়? —কে এখানে ধনী লোক আছে যে আমার এই হার কিনতে পারে?

গলা হইতে উন্মোচিত হার হাতে লইয়া অজয় ছুটিতে লাগিল। হার অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইল। দোকান হইতে কাপড় লইয়া বাহিরে আসিতেই দোকানদার তাহাকে চোর বলিয়া চাপিয়া ধরিল।

—ওঃ তোমার টাকা দি নি বুঝি, এই নেও বলিয়া তাহাকে তিনটী টাকা ফেলিয়া দিয়া অজয় ছুটিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে সম্মুখে ডাক্তারের সাইনবোর্ড দেখিতে পাইল।

ডাক্তারখানায় ঢুকিয়াই ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এক বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিনা পালকীতে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন, পালকী না হলে আমি কোনও বাড়ী রোগী দেখতে যাই না। কোথায় পালকী পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করিয়া অজয় পালকীর আশায় ছুটিয়া যাইল। পালকী আসিল।

ডাক্তারবাবু ভবেশের বাড়ীতে আসিলেন, কিন্তু তখন সব শেষ! বালকের দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণবায়ু চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার দূর থেকে বুঝিতে পারিয়াই ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ মাতা মৃত শিশু কোলে করিয়া একমনে ভগবানকে ডাকিতে ছিলেন। ছেলে ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাতাস করিতেছিলেন?

অজয় পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কোনও লজ্জা না করিয়া ভবেশের স্ত্রী বলিলেন, খোকা আপনিই ভাল হয়ে যাচ্ছে; এখন একটু ঘুমুচ্ছে। উনি গেলেন কোথায়?

কোনও উত্তর না দিয়া বাঁ হাতের কাপড় জোড়া হতভাগিনী মায়ের বুকে ফেলিয়া দিয়া, অজয় একদৃষ্টে

ছেলের মুখপানে তাকাইয়া রহিল···এই দেবশিশু বিনা চিকিৎসায় ও অযত্নে আজ কোথায় ?

বৃদ্ধা দাওয়া হইতে উঠিয়া ঘরের ভিতর আসিলেন ; শিশুটী মৃত বুঝিতে পারিয়া অজয়ের মুখপানে তাকাইলেন।

অজয় তাহাকে ভবেশের স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিতে ইঙ্গিত করিল এবং নিজে ছেলেটীকে দুই হাতে ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। বাহিরে রাখিয়া পুনরায় ঘরে যাইয়া দেখিল, মাতা অজ্ঞান—বৃদ্ধা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কোনওরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মা মা করিয়া অজয় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। একটু জ্ঞান আসিতেই অজয় ডাকিতে লাগিল, মা এই যে আমি, কোথায় ত যাই নি! তুমি একটু শান্ত হও।

চোখ মেলিয়া ভবেশের স্ত্রী নীরবে উবুড় হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধাকে কাছে বসাইয়া অজয় নিজেই শিশুকে কাঁধে লইয়া বাহির হইল।

[১৩]

বহু কষ্টে কোনও রূপে মৃতদেহের সৎকার হইল। অজয় ভবেশের বাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, টাকার জন্য আজ কি হারালুম! হয়ত কিছুকাল আগে এলে একে বাঁচাতে পারতুম। মার কোল থেকে যাকে কেড়ে আনলুম, এখন কোন প্রাণ নিয়ে তার সম্মুখে যাব,—আছে জীবনের মূল্য আছে, নিশ্চয়ই আছে।

কাতর মুখে অজয় বাড়ীতে ঢুকিল, তাহার পা আর চলিতে চায় না। ভিতরের দিকে যাইয়া দেখিল, ভবেশের স্ত্রী শক্ত হইয়া উঠিয়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতেছে। বৃদ্ধা লোকটা তখন সেখানে নাই।

অজয়কে দেখিতে পাইয়া ভবেশের স্ত্রী বলিল, তিনি কোথায় ঠাকুর পো?

হাঁ করিয়া অজয় বউদিদির মুখের পানে চাহিয়া তাহার কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিল। কিসের জোরে তিনি আজ এতশীঘ্র এতখানি শক্ত হইলেন ;

অজয়কে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বউদিদি বলিল, ঠাকুরপো তুমি তাকে দেখ। তার আজ আর কোন সান্ত্বনা নাই।

অজয় কাতরমুখে বলিল ওগুলো রাখইনা বউদি ? এত তাড়াতাড়ি কেন ?

—না ঠাকুরপো, তিনি এসে এইখানে গড়াগড়ি দেবেন। অসুখ করতে পারে। ঘরময় অসুখের বীজ ছড়িয়ে আছে। আমি চান করেই এসেছি।

অজয় মনে মনে ভাবিল, এ কি ?…

অজয়ের পানে চাহিয়া কামিনী বলিল, তাকে বুঝি পাও নি ? কোথায় তিনি, শীঘ্র খুঁজে নিয়ে এস। দেখ, তিনি হঠাৎ একটা কিছু করে না বসেন। বড়ই ভালবাসতেন তিনি একে। শেষের দেখা, একবারও দেখতে পারলেন না।

—ভয় নাই আমি তাকে খুঁজে নিয়ে আসছি. বলিয়া অজয় ছুটিল ?

• • • দিনমান চলিয়া গেল। অজয় ভবেশের কোন

সন্ধান পাইল না। ব্যথিত চিত্তে ও কম্পিত পদে বৌদির সম্মুখে আসিয়া অজয় বলিল, তাকে খুঁজে পেলুম না বৌদি…

—পেলেন না বলিয়া কামিনী বসিয়া পড়িল। একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া কামিনী বলিল, তোমার সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। বস, আমি কিছু চড়িয়ে দিইগে।

অজয় কোনও কথা বলিতে পারিল না। এই নারীর হৃদয় স্বচ্ছ কাচের মত, তাহার নিকট পরিষ্কৃত হইয়া গেল। তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া উন্মুক্ত আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। চারিদিকেই শান্তি! পৃথিবী তেমনি ভাবে চলছে; তারা জ্বলিতেছে। তাহার মন হইতে জোরে জোরে কেবলই শব্দ হইতে চায়, ভবেশদা, দুর্ভাগা ভবেশদা একবার এস, ছুটে এস। সবশেষ হয়ে গেছে!

কতকক্ষণ যে এমন ভাবে কাটিল অজয় তাহা বুঝিতে পারিল না। নিজের বাড়ী, ঘর দুয়ারের কথা সমস্ত তাহার মন হইতে চলিয়া গেল। হঠাৎ কামিনী আসিয়া ডাকিল, ঠাকুরপো? কিছু খেয়ে নাও।

অজয় বালকের মত উঠিয়া যাইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে খাইতে বসিল।

পাশে দাঁড়াইয়া কামিনী বলিল, দুঃখ করে আর কি করবে ঠাকুরপো? এ, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হয়ত আরও কত দেখতে হবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনী পুনরায় বলিল, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় আজ টাকার মূল্য বুঝিয়ে দিয়ে গেল। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা গেল।

অজয় একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমিও আগে টাকা চিনতে পারি নি, বৌদি। এমন কি কেউ ঐ গ্রামে ছিল না, যে ছেলেটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে পারত।···

কাতর ভাবে কামিনী বলিল, পর কেন করবে ভাই? সে আশা আমি করিনে। গরীবের ছেলেরা এই রূপেই মরে যেতে আসে। তাদের দিকে তাকাতে কেউ থাকে না। থাকবেই বা কেন? তারা নিজেরাই টাকা উপায় করে অভাব দূর করতে পারে ত।···

অজয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, পরের চক্ষের জল যেটুকু মুছাতে পারে সেটুকু চেষ্টা করবে।

আহার শেষ হইয়া গেল। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া অজয় বলিল, বৌদি আমার মাথা খাও তুমি খেতে বস।

তীব্র দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের পানে চাহিয়া কামিনী

বলিল, তোমার এ কথা রাখা আমার পক্ষে যে অসাধ্য ভাই। তিনি না খেয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। তিনি যে জানেন ঘরে চাল নেই!

অজয়ের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। মাথা নত করিয়া দূর হইতে বৌদিকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার মন বলছে, তিনি অভূক্ত নেই। এতক্ষণ আকাশের পানে তাকিয়ে ছিলুম। সেই কথাই শুনতে পেয়েছি। তোমার পায় পড়ি বৌদি, তুমি কিছু মুখে দিয়ে নাও। নতুবা আমার মনের আগুন আরও জ্বলে উঠবে; আমি এখানে দাঁড়াতে পারছি নে।

কামিনা ঘরের ভিতর যাইয়া সামান্য কিছু আহার করিয়া লইল। আহার শেষ হইলে অজয় বলিল, বউদি তুমি ঘরে বসো, আমি দেখি যদি সেই বৃদ্ধাকে ওবাড়ী থেকে ডেকে আনতে পারি।

অনেক চেষ্টা করিয়াও অজয় কৃতকার্য্য হইল না। সে স্পষ্ট জানাইয়া দিল, ও কাল রোগের বাড়ীতে আমি রাত যাপন করতে পারব না।

হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অজয় বলিল, সে এল না বৌদি। তুমি দরজা দিয়ে শোও, আমি বাহিরে দাওয়ায় বসে আছি।

নিরুত্তরে দরজা দিয়া কামিনী মাটীর উপর পড়িতেই মুর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া গেল। পুত্রশোক, ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙিয়া ফেলিল।

* * *

রাত্রি প্রভাত হইতে অজয় আবার ভবেশের খোঁজে বাহির হইল। যতদুর সম্ভব, খুঁজিয়া ভবেশের কোনও সন্ধান পাইল না। মুখ ফুটিয়াও সে কথা কামিনীকে স্পষ্ট বলিতে পারিল না। বাড়ীর বাহিরে একটি গাছ তলায় বসিয়া অজয় ভাবিতেছে, এমন সময় একটি অপরিচিত বালক তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল।

পত্রের হস্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি পড়িতেই অজয় পাগলের মত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, পেয়েছি—পেয়েছি—তাঁর সন্ধান পেয়েছি, আর কোথায় পালাবে!...

অজয় পত্র খুলিয়া ফেলিল। পত্রে লেখাছিল—কামিনী! কোনও ডাক্তার ভিজিটের দাম বাকী রেখে ছেলেকে দেখতে চাইল না, কিংবা একটু ঔষধও দিল না। তাদের জনে জনের পায় ধরে বললুম টাকা মারা যাবে না, কেউ বিশ্বাস করলে না। আর কি করব? এখন ভগবানই উপায়! ঘরে চাল নেই, ছেলের পথ্য দিবার পয়সা নেই, কেউ একটী পয়সাও ভিক্ষা দিল না। বাপ হয়ে একমাত্র

ছেলের মৃত্যু চোখের সামনে আর কি করে দেখব! পারলুম না—পয়সার অনুসন্ধানে ছুটলুম। পয়সা না নিয়ে আর ফিরে আসছি নে। তা যেরূপেই হক; চুরি ডাকাতি, জাল, জুয়াচুরি কিছুই মানব না।......

তোমার ভালবাসা আমাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে নতুবা এরূপ বিপদে হয়ত, আত্মহত্যা করতুম।

সে ভয় করো না। ভগবানের উপর নির্ভর করে বসে থাকো। যা হয় হবে। আমি টাকা নিয়ে ফিরে আসবই।

ভবেশের পত্রখানা পড়িয়া অজয় কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল।

---

[১৪]

দেওয়ানজী একটী একটী করিয়া কাগজ পত্র কমলার সম্মুখে ধরিতেছিল, আর কমলা একাগ্রচিত্তে সমস্ত পড়িয়া শুনিয়া দস্তখত করিয়া দিতেছিল। ইদানিং অসুখে পড়া থেকে মায়ের কঠোর আদেশ ছিল, জমিদারীর প্রত্যেক কাগজ পত্রে কমলাকে দেখাইয়া তাহার দস্তখত লইতে হইবে।

হঠাৎ একটী হিসাব দেখিতে দেখিতে কমলা বলিল, এখানে দেখছি পাঁচটাকা খয়রাৎ লেখা আছে। কার হুকুমে এ ভিক্ষা দেওয়া হল ?

বৃদ্ধা দেওয়ানজী মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, ও একটা গরীব বামুন এসেছিল ; কন্যাদায় জানালে, তাই তাকে ভিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

কমলা দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এরূপ দান আপনারা মাঝে মাঝে করে থাকেন কি ?

বৃদ্ধ দেওয়ানজী বলিলেন, ঠিক নজীর নেই, তবে কদাচিৎ কখনও হয়ে থাকে।

—না, তা হতে পারবে না। সম্পত্তির মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনও কর্ম্মচারী কিছু দান করতে পারে না এটা জেনে রাখুন।

দেওয়ানজী বলিলেন, তা হলে এ পাঁচটা টাকা মঞ্জুর হবে না ?

—সে ক্ষমতা ত আমার নেই, মাকে বলে দেখবেন, বলিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে কমলা আর একখানি কাগজ দেখিতে লাগিল...এ কি ? এতদিনের খাজনা বাকী ?

—অনাদায় হবে বলে নালিশ করা হয় নি। ষ্টেটের কতকগুলো টাকা হয়ত বৃথা খরচ হতে পারে।

সতেজে কমলা বলিল, আপনি কি বলতে চান, এই অনাদায়টা প্রথম বছরের বাকী থেকে আরম্ভ হয়েছে ?

দেওয়ানজী মুস্কিলে পড়িলেন, বুঝিতে পারিলেন, ইহার নিকট কোন কৌশলই খাটিবে না। নিজেকে শোধরাইতে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "সরজেমিনে" যেয়ে তদ

করবার সুবিধা পাইনি মা। তবে মফঃস্বলের কর্ম্মচারীর রিপোর্টে জানা যায়, টাকা আদায় হবার সম্ভবনা নাই।

—কার দোষে এ-টাকাটা পড়েছে ?

—সেই মফঃস্বলের কর্ম্মচারীর দোষে।

—নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীর ভুলদোষে থাকতে পারে। তাকে সব সময় সৎ আশা করা নাও যেতে পারে, কিন্তু আপনি কি করছিলেন ? পড়তি টাকার সিকি তার আমি জরিমানা করলুম। হয় তিনি টাকা আদায়ের উপায় করে দিন, তজ্জন্য ষ্টেট কোন খরচ করতে পারবে না। নতুবা এই অনাদায়ের সিকি তাহার মা হনা থেকে কেটে নেওয়া হোক্। হুকুম লিখিয়াই কমলা দস্তখৎ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ দেওয়ানজী সেদিন আর কোন কাগজ পত্র না দেখাইয়া বলিলেন, দুটী প্রজা আপনার কাছে দরবার করতে চায়।

—তাদের অভিযোগ শুনেছেন ?

দেওয়ানজী আগে থেকে কোনও বিষয় জেনে রাখেন নি। অথচ সঙ্গত প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে যে কড়া মুনিব হয়ত একটা কথা বলিয়া বসিবে ভাবিয়া বলিলেন, না মা, তাদের ভিতর একজন স্ত্রীলোক বলে শুনতে সাহস করিনি।

—ভবিষ্যতে অভিযোগের ব্যাপারটা জেনে নেবেন

এবং কাগজপত্রগুলো আগে থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, নতুবা আমি তাদের কি উত্তর দেবো! প্রজা তারা, আপনি মোনিব, প্রজায় প্রজায়, মোনিব ও প্রজায় যেরূপ গোলমাল হক না কেন, সাধ্যমত ন্যায় বিচার করতে চেষ্টা করতে হবে, এ কথাটী বুঝে রাখিবেন। যান মেয়েটীকে পাঠিয়ে দেনগে। আর ব্যাটা ছেলেটীর অভিযোগ আপনি আগে থেকে জেনে নিন।

এক মধ্যবয়স্কা রমণী কমলার ঘরে ঢুকিল। কমলা গম্ভীর ভাবে বলিল, কি অভিযোগ তোমার বল?

লজ্জিতভাবে মেয়েটী বলিল, আপনার রাজত্বে বাস করে সে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, আমার পেট চলে কি করে বলুন? ছেলে মেয়ে দুটোকে বা কি খাওয়াই? তাই আপনার কাছে, বিচার চাই।

ভাবিতে ভাবিতে কমলা বলিল, তোমার স্বামী কি চির দিনই এইরূপ ছিল?

সলজ্জভাবে রমণী উত্তর দিল, আগে বাড়ীতে থাকত, যা পেত উপায় করে এনে আমার কাছে দিত। আমার বয়স হতে এখন আর বাড়ীতে থাকতে চায় না। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

—তুমি কারণ জিজ্ঞাসা কর না কেন?

—করেছিলুম মাজি, বলে কিনা, আমাকে এখন আর তোর ভাল লাগে না।

—তোমার নাম কি ?

—রূপসী।

গম্ভীর ভাবে কমলা বলিল, দেখ রূপসী, পুরুষ মানুষ কতকটা রূপ আশা করে। এটী তাদের ন্যায়সঙ্গত আশা। তুমি যেরূপ ময়লা কাপড় পরে, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন রয়েছ তাতে যদি তার তোমাকে ভাল না লাগে, বেশী দোষ দেওয়া যায় কি ?

কমলার কথায় রূপসীর মনে মনে রাগ হইল অথচ জমিদারের সম্মুখে সে রাগ প্রকাশ করিতে পারে না; তথাপি বলিল, মুখপোড়া মিনসে সে কথাও ত মুখ ফুটে বলে না—বললে, তাকে বুঝিয়ে দিতুম, সে নিজে কত পরিষ্কার।

হাসিয়া কমলা বলিল, খেটে খুঁটে বেটা ছেলেরা তোমাদের কাছে এসে বসে, দুটো মিষ্টিকথা পাওয়ার জন্যে। সেখানে কড়া কথা শুনলে সে কেন তোমার কাছে আসবে ?

রাগিয়া রূপসী বলিল, না এসে সে যাবে কোথায় ? টাকা ফুরোলেত আমার কাছেই আসতে হয়।

নারীর রূপ

—টাকা দিস্!

মুখ নত করিয়া রূপসী বলিল, যে খোসামোদ করে, না দিয়ে পারিনে মা।

গম্ভীর ভাবে কমলা বলিল, আমার কথা শোন; সব গোল মিটে যাবে…

ব্যগ্রভাবে রূপসী বলিল, কি, কি, বল না মা? আমি জ্বলে পুড়ে মারা গেলুম।

—হয় তুই শক্ত হ। তোর কাজ ঠিক মত করে যা। তার কাছে নিজের দুর্ব্বলতা জানাস নে; নতুবা মিষ্টভাষী হ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক। আর কখনও চেহারা খানাকে নোংরা করে তার সামনে ছেলেকে মাই দিতে বসিস্ নে……

রূপসী কমলার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার বুঝিবার বয়সও ছিল না। সে স্বামীর আদর যত্ন সোহাগের তোয়াক্কা রাখে না। সে চায়, টাকা কড়ি। কোনও মতে দুটো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জোগাড় হলেই হয়॥

তাহার নিকট এখন স্বামীও যা, বাড়ীর গাই গরুও তাই। সে চায় একজন দুধ দিক, আর একজন পয়সা দিক্।

কাতর মুখে কমলাকে বলিল, কই তাকে ত ধরে আনতে হুকুম দিলেন না, মা?

হাসিয়া কমলা বলিল, তাহলেই তুই সন্তুষ্ট হস্।

—বিয়ে যখন করেছে তখন খেতে দেবে না কেন মুখপোড়া।

হাঁা, সেইটিইত সব চেয়ে বড় জোর। ওতেই তোর মাথা খাওয়া গেছে। তুইও ত উপায় করে খেতে পারিস।

কমলার কথায় লজ্জায় রূপসী মুখ নত করিল। কমলা বলিল, আচ্ছা তুমি বাড়ী যাও, আমি তোমার স্বামীকে ডেকে এনে ধমকে দেবো, কিন্তু বাড়ীতে ধরে রাখা তোমার কাজ।

[১৫]

সন্ধ্যার সময়ে দেওয়ানজী কমলার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া একতাড়া কাগজ তাহার সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, সকাল বেলার আবেদন প্রার্থী দরখাস্ত পেশ করছে। সে একটা হুকুম চায়।

দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাইয়া কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কমলা বলিল, আপনাদের মন্তব্য কোথায় ?

দেওয়ানজী আর এক তাড়া কাগজ দিয়া বলিলেন, এই বসতবাড়ী ও জমি আমাদের মোহনপুর কাছারীর অন্তর্গত। যতদূর জানতে পারা গেছে, মনে হয় এই জমি ও বসতবাড়ী রামধন মুখার্জ্জির ছিল।

কমলার পিতার নাম মনে পড়িল। শক্ত হইয়া দেওয়ান-জীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন গ্রামে এ জমী ?

—নায়েকপুরে। কমলা শিহরিয়া উঠিল। নায়েকপু

যে তাহাদেরই গ্রাম। চুপ করিয়া দেওয়ানজীর কথা শুনিতে লাগিল।

দেওয়ানজী বলিতে লাগিলেন, এক সময় এই গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়।

কাতর মুখে কমলা বলিল, আমাদের তরফ থেকে বোধ হয় তখন কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।

ইহার সঙ্গে এ কথা কেন আসিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজী বলিলেন সে খবর, কাগজ পত্রে বিশেষ কিছু নাই।

—তার পর ?

—একই রাত্রে রামধন ও তাহার স্ত্রী মারা যান। সে অবধি বাড়ীটী তালা দেওয়া পড়ে রয়েছে। পূর্ব্ব হইতেই দুই তিন বৎসরের খাজনা বাকী। আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এই লোকটী এক হাজার টাকা নগদ সেলামী দিয়ে ঐ বসতবাটী ও জমিজমা বন্দোবস্ত করে নিতে চায়। খাজনাও কিছু বাড়তি দেবে।

কমলা একমনে দরখাস্ত খানা পড়িতে লাগিল। তাহার আর কোনই সন্দেহ রহিল না যে রামধন তাহারই পিতা। দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া কমলা বলিল, এঁর কি কোন উত্তরাধিকারী নাই ?

—গ্রামে ত কেউ জ্ঞাতি কুটুম্ব নেই। আবেদনকারী বলছে, মেয়ে থাকতে পারে—তবে সে বিষয়ে বিশেষ খোঁজ নেওয়া হয় নি।

ভাঙাগলায় কমলা বলিল, সে বিষয় একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। তারাই ত উত্তরাধিকারী। যদি তারা আমাদের পাওনা গণ্ডা মিটেয়ে দেয়।

কমলা নিজের সাজ গোজের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া লইল। পৈতৃক ভিটা বিক্রী হইতেছে··· কিন্তু···

কমলা দরখাস্তের উপর লোকটাকে তিনমাস পরে আসিতে বলিয়া, হুকুম লিখিয়া দিল। ইতিমধ্যে দেওয়ানজীকে সবিশেষ খোঁজ লইতে বলিল।

দেওয়ানজী বলিলেন, অজয়বাবু চারশ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সরল ভাবে কমলা বলিল, কি জন্যে?

—আমাকে লিখেছেন, তহবিল হতে কর্জ্জ হিসাবে যেন দেওয়া হয়। মাকে লিখলে দেবেন কি না সেইজন্য লেখেন নি। এ তার নিজেরই খরচের জন্য—

কমলা বলিল, এ বিষয়ে অনুমতি দেওয়া আমার ক্ষমতার বাহিরে—মাকে বলবেন।

দেওয়ানজী চলিয়া গেলেন। কমলা বসিয়া কতকি ভাবিতে লাগিল।

* * *

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্রীমায়ের ঝি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

কমলা ঘরে ঢুকিতেই তিনি তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কমলা বসিয়া মায়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাতা কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কর্ম্মচারীরা এক গরীব ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা দান করেছিল, শুনলুম, তুই তা মঞ্জুর করিস নি!

কমলা মুখ নত করিয়া বলিল, সে ক্ষমতা ত আমার নেই; আমি আপনার নিকট অনুমতি নিতে বলেছি।

অভিমান ভরে কমলার মাতা বলিলেন, না ও সব বিষয়ে আর মাথা ঘামাব না। এইরূপেই ওরা আমাকে ঠকিয়ে নেয়। আমি তোর মত ভাল করে দেখতেও পারি নে।

কমলা বলিল, অজয়দা চার শ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন…

—তুই তাকে আমার অসুখের কথা লিখিস নি ?

—লিখেছি।

—সে আসতে পারলে না তবে দরকার নেই টাকা পাঠিয়ে। দেওয়ানজীকে একবার ডাকত।

দেওয়ানজী আসিলে মাতা কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেওয়ানজীর সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে।…

কমলা উঠিয়া গেল। কর্ত্রীমা দেওয়ানজীকে বলিলেন, আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ ; মানুষের শরীর, কখন কি হয় বলা যায় না।

কাতর মুখে দেওয়ানজী বলিলেন, ও কথা বলবেন না মা, আপনার অভাবে সংসার……

—না কিছুই হবে না। আমি এমন হাতে রেখে যাচ্ছি যে আমার চেয়ে ভাল চালাতে পারবে। মেয়ে ত স্পষ্ট অভিমান করে বলে গেল, তার দান করবার ক্ষমতা নাই। এ ক্ষমতা তাকে দিতে হবে। আপনি উকীলের বাড়ী থেকে একটা উইলের খসড়া করে নিয়ে আসুন ত। সমস্ত সম্পত্তি আমি কমলাকে দিয়ে গেলুম, এই মর্ম্মে।

দেওয়ানজী কর্ত্রী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

এই কি ঠিক হবে মা? আপনি অপরের হস্তে সমস্ত দিয়ে যাবেন?

—অপর কে? আমি এতদিন এই জমিদারী চালালুম। খুব লোক বুঝতে পারি।

দেওয়ানজী দেখিলেন কোন কথা বলিলে ফল হইবে না। চুপ করিলেন।

—অজয় কি টাকা পাঠানোর কথা লিখেছে?

—হাঁ মা।

—অত টাকা চাইলে যেন টাকা দেওয়া না হয়। টাকা না পেলেই বুঝতে পারবে, কাঞ্চনের মূল্য কতটা?

কর্ত্রীমা বুক চাপিয়া চোখ বুজিলেন।

[১৩]

দুই এক দিন যাইতে না যাইতে কমলার পৈত্রিক-সম্পত্তির ক্রেতা বৃদ্ধ লোকটী এৎলা দিয়া কমলার সন্মুখে আসিয়া জোড় হস্তে বলিল, হুজুর আপনার অনুমতি পেলে ঐ সম্পত্তি আমি মৃত রামধনের উত্তরাধিকারীর নিকট হতে কিনিতে চাই।

কমলা আগ্রহের সহিত বলিল, কোথায় পেলে তুমি তার উত্তরাধিকারী ?

—রামদেবি গাঁয়ে এসেছে। তার নাম ভবেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; রামধন বাবুর জামাই।

কমলার মনের ভিতর গোলমাল হইতে লাগিল। অতি কষ্টে নিজকে সংযত করিয়া বলিল, কত টাকায় তিনি সম্পত্তি বেচতে চান ?

—খুব কম মুল্যে হুজুর। তার বিশেষ টাকার দরকার তাই এই সময় নিতে পারলে সুবিধা হয়।

—তিনি যদি উত্তরাধিকারী হন, তবে এত কম মূল্যে বিক্রী করবেন কেন ?

—আর ত গ্রাহক নাই। একে পড়ো বাড়ী, তাতে রামধনের ও বাড়ীতে ভালো হল না।

কমলার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। শক্ত হইয়া বলিল, তবে তুমি বাড়ী নিয়ে কি করবে ?

লজ্জিতভাবে বৃদ্ধ বলিল, আমার একটী গুরুঠাকুর আছেন, তাঁর বাসের জন্য ঐ জায়গাটা তিনি পছন্দ করেছেন।

—তারও ত অনিষ্ট হতে পারে।

—ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী তিনি, সে ভয় করেন না। আর দোষ কি তার কাছে সহজে আসতে পারে।

কমলার মনে পড়িল, এখন সেই ত সম্পত্তির মালিক। সামান্য টাকার জন্য তাহার পৈত্রিক বাড়ীটা বিক্রয় হইবে। না, তা হতে পারে না; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল,—রামধনের কন্যা মরে গেছে; যদিও তার প্রেতাত্মা তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই এমন জমিদার বংশের কার্য করছে। এ বংশের গৃহলক্ষ্মী এখন তার হাতে ন্যস্ত। সে শুধু সেই দিকটাই মেনে চলবে।

কিন্তু কই তাহা, ত সে পারছে না। কেন সে এত

খোঁজ নিচ্ছে। সম্পত্তি বিক্রয় হউক ষ্টেটের লাভ হবে।

বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কত টাকা তুমি ষ্টেটকে দেবে।

—পাঁচ শত টাকা।

ষ্টেটের পাওনা খুব অল্পই মনে হইল। এই সামান্য পাঁচশ টাকার জন্ম সে নিজের হৃৎপিণ্ডটী ছিঁড়িয়া ফেলিবে চারিদিকে চাহিয়া ভাবিয়া লইল, কই তাহার ত নিজের এক পয়সা নাই। মায়ের নিকট চাইলে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু এই রোগের সময় তাহাকে বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করিল না। বলিল, বৃদ্ধ আমি একবার হুকুম দিয়েছি। সে হুকুম তোমাকে মানতেই হবে। তোমাকে তিনমাস অপেক্ষা করিতেই হবে।

অতি কাতর ভাবে বৃদ্ধ হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি আপনার প্রজা; দোহাই হুজুর, আমি খুব আশা করে এখানে এসেছি। তিন মাসের ভিতর বিক্রেতা হয়ত তার মত বদলে নেবে। ইষ্টদেবকে এই বাড়ী খানি দিয়ে যেতে পারলে আমি একটা কাজ করে যেতে পারি। আর কদিনই বা আমি সংসারে আছি।

—পরকালের সহায় করতে সম্পত্তি দেবে বুঝি ?

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বৃদ্ধ বলিল, হাঁ, মা, দিনত চলেই গেল, একটু পরকালের সংস্থান করে নিতে চাই।

বুক চাপিয়া ধরিয়া জোরের সহিত কমলা বলিল, না তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। তিন মাসের পূর্ব্বে আমি আর কোন কথা শুনতে চাই নে।

কমলা জোর করিয়া উঠিয়া গেল, যদিও তার পা তখন টলিতেছিল। দেওয়ানজীকে ডাকাইয়া তখনি বলিল, রামধনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পেয়েছেন তবে তার নিকট থেকে খাজনা অদায় করছেন না কেন?

বৃদ্ধ ইতিপূর্ব্বে নজর দিয়া দেওয়ানজীকে হাত করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি বলিলেন, সে চেষ্টা করেছি মা, কিন্তু লোকটী কিছুতেই খাজনা দিতে চায় না, বড়ই গরীব।

কমলার ভগ্নীপতি ত গরীব ছিল না। মায়ের নিকট হইতে সে কতবার ভবেশ বাবুর সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছে। জানিত দিদি সুখেই ঘর করিতেছে। বাবার সঙ্গে সামান্য একটু ঝগড়া হওয়াতে তিনি সাত আট বৎসর শ্বশুরবাড়ী আসেন নি। প্রথম প্রথম আসবার জন্য পত্র লিখিতেন, কিন্তু বাবার অভিমান ভাঙেনি। সন্দেহ ভাঙিতে দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটীর নাম কি?

দেওয়ানজী বিক্রয়ের মুসাবিদা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, ভবেশ মুখার্জ্জি।

এ ত তাহারই ভগ্নীপতির নাম। কমলার মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না। মনে ভাবিল, পুরুষমানুষ তিনি তাকেই খাজনা দিতে হবে। মেয়েরা কোথায় পাবে? তারা ত খেটে টাকা আনতে পারে না। হালকা ভাবে বলিল, আপনারা একটু জোরে চেপে ধরুন না! সম্পত্তি ভোগ করতে হলে খাজনা দিতে হয়। আপনারা ত খাজনা আদায়ের অনেক কৌশল জানেন।

হাসিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, সে যে সম্পত্তি বিক্রয় করতে চায়। পরের পাওয়া সম্পত্তি, এর উপর তার কি মায়া দয়া আছে? মায়া দয়া থাকলেই ত তবে লোকে খাজনা পত্র দেয়, রাখবার জন্য চেষ্টা করে।

কমলা বিপদে পড়িয়া বলিল, সম্পত্তি ত তিনি নিজে বিক্রয় করতে পারেন না, ভোগ দখল করতে পারেন মাত্র। প্রকৃত উত্তরাধিকারী তার স্ত্রী।

—হাঁ সে কথা সত্যি মা! আমি আবেদনকারীকে তাই বলব।

—সে বিষয়ে আমাদের কি দরকার? তার নিকট থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করুন।

কঠোর আদেশ পাইয়া দেওয়ানজী মফঃস্বলের নায়েবের প্রতি এ আদেশ জানাইলেন। প্রার্থীকেও বলিয়া দিলেন, ভবেশ বাবুর স্ত্রীর অনুমতি না পাইলে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে না।

বৃদ্ধ লোকনাথ কথাটির মূল্য বুঝিতে পারিয়া সেই চেষ্টাতেই বাড়ী গেল।

* * *

কি উৎকণ্ঠায় কি আবেগের ভিতর যে ভবেশ টাকার জন্য লোকনাথের বাড়ীতে বসিয়া এই দুদিন অতিবাহিত করিতেছিল, সে তাহার অন্তরাত্মাই বুঝিতেছিল। খোকা বেঁচে আছে কিনা? কে তাহাকে খবর দিবে?

কামিনী কি করিতেছে, হয়ত একবার বাহির বাড়ী, একবার ভিতরবাড়ী করিতেছে।

লোকনাথের দেখা পাইতেই ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, কই কোথায় সই করতে হবে বলুন। দিন টাকা, আমি আজ আর অপেক্ষা করতে পারছি নে।

বৃদ্ধ গম্ভীর তাবে বলিল—অত টাকার সম্পত্তিটা দেখে শুনে কিনতে হয়। অনেকবার ফাঁকি পড়েছি।

হাঁ করিয়া বৃদ্ধের মুখের পানে তাকাইয়া ভবেশ অতি

কাতর মুখে বলিল, আপনি আমায় বায়না স্বরূপ পঁচিশটী টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন না ?

—না বাবাজী টাকা অত সস্তা নয়।

ভবেশ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বড় বিপদে পড়েছি। সমস্ত সম্পত্তি নিয়েও আজ পঁচিশটী টাকা আমাকে দিতে হবে। খোকাকে বাঁচাতে হবে। আর যে আমার কিছু নেই।

বৃদ্ধ ভবেশের মুখের পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল লোকটী পাগল, না নেশাখোর।

ভবেশ অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিল, আপনি আমার বয়সে বড়। আপনার পায়ে ধরি বলুন দেবেন ?

ভবেশের হাত এড়াইতে না পারিয়া লোকনাথ বলিল, হ্যাঁ তোমাকে টাকা দেব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি তোমার সম্পত্তিটা ঠিক করে নিতে চাই।

বৃদ্ধের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া ভবেশ বলিল দিন, দিন, আমার মন বলছে এখনও টাকা পেলে তাকে বাঁচাতে পারব।

লোকনাথ বলিল, সম্পত্তির মালিক ত আর তুমি নও তোমার স্ত্রী। আমি তাকেই চাই তিনি সই দিলে আমি টাকা দেবো। চল, তোমার বাড়ীতে যাই।

—বেশ তাই হোক, তবে আসুন, বলিয়া ভবেশ লোকনাথের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

—তুমি পাগল নাকি ? আমি এতদুর হেঁটে এলুম, এখনি কি করে যাব। একটু জিরিয়ে নি।

—আসুন, শীগ্‌গীর আসুন। আমি বড় বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি। আমার টাকার বড় দরকার। গেলেই তা দেখতে পাবেন। হায়! হায়! দেরী হলে বোধ হয় তাকে আর দেখতে পাব না। ঐ সে বাবা বাবা বলে কাঁদছে, আমাকে দেখবার জন্য ছট্‌ ফট্‌ করছে। চলুন, চলুন, শীঘ্র চলুন. আমি চীরজীবন এজন্যে আপনার নিকট বিক্রী হয়ে থাকব।

—কাঁদলে টাকা পাওয়া যায় না। কার্য্যোদ্ধার না হলে টাকা কেউ সহজে দেয় না বাবাজি—

লোকনাথের পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া মুখের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিল, দেয় না; এত বিপদেও দেয় না! বামুনের ছেলে হয়ে পায়ে পড়লেও দেয় না ? তবে .....ভবেশ জোরে মাথা চাপিয়া ধরিল। একটু পরেই লাফাইয়া উঠিয়া লোকনাথের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

———

[১৭]

অনেকক্ষণ ধরিয়া ভবেশের পত্রের বিষয় অজয় চিন্তা করিল। চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ অজয় পত্রখানা হাতে লইয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই, কামিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি হয়েছে ঠাকুরপো? ও কার পত্র?

কামিনীকে ভবেশের সংবাদ দেওয়ার আগ্রহ তখন আর অজয়ের ছিল না। কামিনীর কথায় চমক ভাঙ্গিতেই পত্রখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল, অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইল, ভবেশদার পত্র।

কামিনী আগ্রহের সহিত পত্রখানা তুলিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া কহিল—ঠাকুরপো, তুমি তাকে ফিরিয়ে আনো। আমি সব সহ্য করতে পারবো—উঃ—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনী বসিয়া পড়িল।

অজয় এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ নত করিল। চোখ জলে পুরিয়া আসিল।

অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কামিনী বলিল, ভেবে আর কি হবে? তুমি ছুটে যাও ঠাকুরপো, তাকে ফিরিয়ে আনো।

মন্ত্রচালিতবৎ কামিনীর সম্মুখ হইতে অজয় সরিয়া গেল। ভবেশ দা, ভবেশ দা করিয়া সারা গ্রামখানি অনুসন্ধান করিল। কোথাও সন্ধান মিলিল না।

সন্ধ্যার সময় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অজয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কামিনী মায়ের আদরে তাহার আহারীয় দ্রব্য পাশে করিয়া বসিয়া আছে। এক দিনেই তাহার চেহারার কী পরিবর্তন! চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক। সে আদর্শ শোক প্রতিমার প্রতি চাওয়া যায় না!

অজয় দূরে দাঁড়াইলে, কামিনী সংযত ভাবে বলিল, মুখ হাত ধুয়ে নেও; সারাদিন না খেয়ে ঘুরে বেড়ান উচিত হয়নি। কোন দিন ত অভ্যাস নেই; শরীর ভেঙে পড়বে।

অজয় বলিল, তুমিও ত খাওনি বৌদি?

কামিনী হাসিল। হাসি যে এত বিষণ্ণ করুণ হতে পারে তা অজয় আজ প্রথম বুঝিতে পারিল। কথা না বাড়াইয়া গম্ভীর মুখে আহারে বসিয়া গেল। মায়ের আদরে

কামিনীর তাড়নায় অজয় কিছু না খাইয়া উঠিতে পারিল না।

খাইতে খাইতে অজয় বলিল, বৌদি, দাদার ত সন্ধান পেলাম না।

সংযত ভাবে কামিনী উত্তর দিল, বড় দাগা পেয়ে তিনি টাকার সন্ধানে ছুটে গেছেন, ছেলেটাও তখন ফস্ ফস্ করে তাকে অত ব্যস্ত করে তুলল। আমি কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলুম না; আমারই দোষ।

অজয় কথাটাকে ঘুরাইয়া লইতে বলিল, তুমি দুটো মুখে দিয়ে নেও, আমি সেই বুড়ীটাকে ডেকে নিয়ে আসিগে।

—সে আসবে না ঠাকুরপো, মিছিমিছি অপমানিত হবে।

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অজয় সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর সন্ধানে গেল। একটু পরে একাকী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কামিনী তাহার অপেক্ষায় গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। অজয় বলিল, অনেক খোসামুদ করলুম, সে এল না বৌদি। তুমি শোওগে, আমি বাইরের ঘরে যাচ্ছি।

—কি করে থাকবে ওখানে?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অজয় বাহিরের

ঘরে যাইয়া স্যাৎস্যেতে মেঝেতে নিজের জামা বিছাইয়া হাতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল। ঘরের চাল সব জায়গায় ফাঁকা। উন্মুক্ত আকাশের ঘনীভূত অন্ধকার আসিয়া অজয়ের চোখের সামনে পড়িল।

* * *

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অজয় ভবেশের সন্ধান করিতে পারিল না। সেদিন যথা সময়ে নিজ হস্তে বাজার করিয়া আনিয়া ভিতরে রাখিয়া অজয় বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, এমন সময় কামিনী গ্রামাপুকুর থেকে স্নান করিয়া জলভরা এক কলসী কক্ষে তাহার সম্মুখ দিয়া ভিতরে গেল।

আজ কামিনী স্নান করিতে যাইয়া পুকুর ঘাটে তাহার এবং অজয়ের সম্বন্ধে অনেক বিশ্রী সমালোচনা শুনিয়াছিল। এক বৃদ্ধা অপরকে বলিতেছিল, এমন ত কখনও দেখিনি, যে স্বামী বউ বিক্রী করে দেশ ছেড়ে চলে যায়।

অপরটী বলিল, কামিনীর বরাত ভাল। এবার দুমুটো খেতে পাবে। অমন রাজপুত্রের মত চেহারা, বোধ হয় অনেক টাকা আছে

প্রথম বৃদ্ধা গালে হাত দিয়া বলিলেন, কি হল গো? লোকে বাড়ী ঘর দুয়ার বিক্রী করে জানি; দেনার দায়ে বউ বিক্রী করে, এ ত কখনও শুনিনি।

দ্বিতীয়া বলিলেন, সে কি আর করেছে ওই জুটিয়ে নিয়েছে।

পার্শ্বস্থিতা জগতের মা বলিল, বেশ করেছে। ভাত কাপড় দিতে পারিস নে, তবে বিয়ে করেছিলি কেন? ওর ত পেটটা চলা চাই।

একটু দূরে স্নান করিতে থাকিলেও প্রত্যেক কথা কামিনীর কানে যাইতেছিল। সে ডুব দিল……মনে ভাবিল উঠিব না।……না, তিনি ফিরিয়া আসিবেন! কামিনী তাড়াতাড়ি জল লইয়া বাড়ী অভিমুখে চলিল।

কলসী নামাইয়া রাখিয়া আসিয়া কামিনী অজয়কে লক্ষ্য করিয়া কঢ় স্বরে বলিল, তুমি বাড়ী যাও ঠাকুরপো, কত দিন আর এখানে থাকবে? কেন এ কষ্ট মাথায় পেতে নেবে?

অজয় বলিল, মাপ কর বৌদি! তোমায় একলা রেখে যেতে পারব না। বরং তুমিও চল, মায়ের কাছে আশ্রয় পাবে।

কামিনীর চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। কোনওরূপে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, তা হয় না ঠাকুরপো। তিনি যখন ফিরে এই বাড়ীতে ছুটে আসবেন্ তখন কে তাকে সান্ত্বনা দেবে?—আমাকে থাকতেই হবে। বরং তুমি যাও, কেন এ কষ্ট সহ্য করবে।

অজয় ভাবিল, তাহার কষ্টে কামিনীর কোমল প্রাণ বিগলিত হইতেছে। অথচ এই নারী তাহার দুঃখে নিজের অবস্থা একবারও ভাবিতেছে না। কোন উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিপদে পড়িয়া কামিনী বলিল, আমাকে এখানে থাকতেই হবে ঠাকুর পো। তিনি ফিরে আসবেন, বড় আঘাত পেয়ে যদি তিনি কোন অন্যায় করে বসেন, সে পাপের ভার আমাকেই নিতে হবে, আমাদের জন্যই তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

ক্ষণকাল পরে কামিনী গাঢ় গলায় বলিল, ঠাকুরপো। আমাকেই যে তাকে টেনে তুলতে হবে। তার আর কেউ নেই!

অজয় ভবেশের সন্ধানে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

---

[১৮]

লোকনাথ ভবেশের হাত ধরিয়া কয়েক ঘণ্টা চলিয়া কাতর মুখে বলিল, আমি ত আর চলতে পারছিনে বাপু…

উদ্‌ভ্রান্তের মত ভবেশ বলিয়া উঠিল, খোকা, বাবা বাবা করে ডাকছে শুনতে পারছ না…

ভবেশ প্রকৃতিস্থ নয়, বুঝিতে পারিয়া সুচতুর লোকনাথ তাহার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে কাতরমুখে বলিল, দেখত পা-টা কিরূপ ফুলে উঠেছে…আরত চলতে পারছিনে বাবা…

—ওঃ, সত্যিই ত তুমি চলতে পারছ না মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া ভবেশ ভাবিতে লাগিল, এখন কি করা যায় বাড়ী যেতে দেরী করাত চলে না…

ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণকাল পরে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, হাঁ ঠিক হয়েছে,…খোকা বিপদে তার বাবাকে ডাকছে…

আমিও নিরুপায় হয়ে আমার বাবাকে ডাকি, তাহলেই উপায় হবে !...

তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র পথের উপর হাটু গাড়িয়া বসিয়া বিপন্ন ভবেশ গোধুলি লগ্নে এক মনে সর্ব্বশক্তিমানকে ডাকিতে লাগিল। অস্তাচলগামী সূর্য্য কিরণ তাহার সম্মুখে শস্যের উপর পড়িয়া বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা জানাইতেছিল।

লোকনাথ ভবেশের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ক্ষণকালের জন্য মোহিত হইল।

ভবেশের প্রার্থনা শেষ হইলে লোকনাথ বলিল, হাঁটতে বড় কষ্ট হবে, খোকাগে, চলে যাই।—

ভবেশ বলিল, আচ্ছা চল, ঐ গাছ তলায় বসে একটু জিড়িয়ে নিগে...

বটগাছ তলায় বসিয়া একটু পরেই ভবেশ দেখিতে পাইল, তাহারই গ্রামের কালু সরকার রাস্তা দিয়া যাইতেছে। ভবেশ আগ্রহের সহিত দু চার বার তাহাকে ডাকিল। কালু সরকার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া ভবেশ ছুটিয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কালুদা, আমার বাড়ীর খবর কি জান ?

তথাপি কালু অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া যাইবার চেষ্টা

করিতে লাগিল। আকুল হইয়া ভবেশ পুনরায় বলিল, বল বল, কালু দা ; কি খবর ?

মুখ বিকৃত করিয়া কালু উত্তর দিল, বাড়ীর খবর কিছু জান না ?—তোমার বউ কি ঘরে আছে !

হতভম্বের মত ভবেশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া কালুর মুখের দিকে চাহিল।

কালু পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমি শুনলুম, তোমার বউ নাকি কোন একজন সুন্দর ছোড়ার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

জোরের সহিত কালু সরকারের হাত ধরিয়া ভবেশ বলিল, বিশ্বাস করিনে ; ছেলের কথাটা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কালু সরকার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, কি স্বার্থ আছে এতে আমার—যা শুনেছি তাই বললুম। ইচ্ছা হয়, সে বউ ফিরে নিয়ে ঘর করগে।

কালু সরকার চলিয়া গেল। ভবেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। লোকনাথ নিকটে আসিতেই বলিল, আপনি বাড়ী ফিরে যান, আমি বাড়ী বেচব না।

হঠাৎ এমন কি হইল বুঝিতে না পারিয়া লোকনাথ বলিল, কি হয়েছে খুলেই বল না ? বেশী টাকা চাও ত ?

রাগিয়া ভবেশ বলিল সে কথা আমি বলব না। বাড়ী আমি বেচব না। অত কথার কি দরকার?

হাসিয়া লোকনাথ বলিল, বেশ লোক ত বাপু, বুড়ো মানুষকে এতদূর হাটিয়ে এনে শুধু শুধু কষ্ট দেবে? আমি যে বড় আশা করে তোমার সঙ্গে এসেছি। সুচতুর লোকনাথ মুখ কাতর করিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিল, হাঁটিতে বড় কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

লোকনাথ কাতর মুখে বলিল। হাঁ, বাবা। চল ঐ গাঁয়ে গিয়ে থাকিগে। কাল যা হয় ভেবে চিন্তে করা যাবে।

ভাবিতে ভাবিতে ভবেশ বলিল, তবে চল ঐ গাঁয়ে গিয়ে থাকা যাক্।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে ভবেশ ভাবিতে লাগিল—না এ মিথ্যা কথা, বাড়ীতে ত যাই...

বিনিদ্র অবস্থায় ভাবিতে ভাবিতে ভবেশের রাত্রি অতিবাহিত হইল।

* * * *

পরদিন সকালে উঠিয়া আবার তাহারা চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইতেই একটী গ্রামের লোককে দেখিতে পাইয়া

ভবেশ ছুটিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের বাড়ীর খবর জানেন ?

লোকটী বিকৃতমুখে কোনও উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

ভবেশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

হস্তমুষ্টি দৃঢ় করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

লোকনাথ আস্তে আস্তে হাঁটিতে হাঁটিতে সেখানে আসিলে, জোরের সহিত বলিল, বাড়ী ত কিনবে, সঙ্গে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছ ?

হাসিয়া রামধন বলিল, চল না, সে কথা সেখানে গিয়ে হবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভবেশ বলিল, দেখি তোমার কাছে কত টাকা আছে, বলিয়াই বাঘের মত লাফাইয়া যাইয়া লোকনাথের পকেটে হাত দিল। টাকা কোঁচড়ের অগ্রভাগে বাঁধা ছিল। সে বলিল, তুমি পাগল হলে নাকি ? ও গ্রামেই আমার টাকা পাওনা আছে। যেখানে হকৃ লোকনাথ টাকা চাহিলে পাবে না এমন ত দু চার গ্রামের ভিতর কোথাও দেখি না।

টাকা কাড়িয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইতে ব্যর্থ মনোরথ

হইয়া ভবেশ বলিল, তবে চল যাওয়া যাক্। অস্ফুট স্বরে বলিল, টাকা লোকে এত সাবধানে রাখে। আর আমি যথাসর্ব্বস্ব হারালুম।

* * *

সকাল বেলায় বাড়ীর পাশের বৃদ্ধা গিন্নি কামিনীকে বেশ দু চার কড়া কথা শুনাইয়া বলিল, কি কেলেঙ্কারী করছিস। এই সেদিন ছেলেটা মারা গেল, আর এর মধ্যে কেলেঙ্কারী করতে লেগেছিস। বেহায়া মেয়ে মানুষ কোথাকার!

উত্তর দিতে যাইয়া কামিনী চুপ করিল।

বৃদ্ধা বলিল, যদি এতই মনে ছিল, তবে গাঁয়ে বসে অত ঢলাঢলি কেন? সহরে যা না।

কোন উত্তর না দিয়া কামিনী ছুটিয়া বহির্ব্বাটীতে গেল। অজয় বাজার করিতে গিয়াছে।

ঝগড়া করিতে না পারিয়া বৃদ্ধা রাগে গসগস করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অজয় বাজার করিয়া লইয়া আসিয়া কামিনীর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, চুপ করে যে বসে আছ বৌ দি? এইগুলি ভিতরে নিয়ে যাও।······

কাতর ভাবে কামিনী বলিল, ঠাকুরপো, তুমি বাড়ী যাও।

বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া অজয় বলিল, তোমায় একলা ফেলে......কি করে যাব ......না পারব না।

—তোমার কি কান নেই ঠাকুরপো। চারি দিকে লোকে দুর্নাম রটাচ্ছে। কেন তুমি সে সব সহ্য করবে?

অজয় বউদিকে প্রণাম করিয়া কাতর ভাবে বলিল, আমি সব বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। কিন্তু আমিও মানুষ......

ভবেশ পিছনে দাঁড়াইয়া জোরের সহিত বলিল, আমি মরি নি। হায় এত কেলেঙ্কারি!......

কামিনী ছুটিয়া ভিতরে গেল। ভবেশ এক দৃষ্টে অজয়ের পানে তাকাইয়া রহিল ও বলিল, এখানে তুমি?

লোকনাথ আসিয়া পড়িতেই ভবেশের মনে হইল ছেলেটার জন্য ত কিছু নিয়ে আসা হয়নি। সে যে এখনি খেতে চাইবে। লোকনাথের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া চার আনা পয়সা চাহিল।

কিছু বুঝিতে না পারিলেও লোকনাথ দুই আনা বাহির করিয়া দিল।

পয়সা দুই আনা হাতে পাইতেই ভবেশ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

---

[১৯]

ভবেশের ছুটিয়া যাওয়ার ভঙ্গীতে অজয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আস্তে আস্তে উঠিয়া ভাঙ্গা ঘরের দরজার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। কাতর মনে ভাবিতে লাগিল, আবার কোথায় গেলেন? এখন কি করা যায়?

লোকনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জোরে বলিল, বাবু ওর কি মাথার গোলমাল আছে কিছু?

—ভবেশ দার?

—হ্যাঁ ওর কথাই বলছি।

ভাবিতে ভাবিতে অজয় বলিল, বড়ই বিপদে পড়েছেন।

বিপদে পড়িয়াছেন শুনিয়া লোকনাথ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিল, এই ত বাড়ী কিনিয়া লইবার উপযুক্ত

সময়। এইবার সে হেস্ত নেস্ত না করিয়া উঠিবে না। সে জোর করিয়া বসিল।

অজয় এদিক ওদিক চাহিতেই দেখিতে পাইল, ভবেশদা ফিরিয়া আসিতেছে।

অজয়ের পাশ দিয়া জোরে ভবেশ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। অজয় কোন কথা বলিবার সুবিধা পাইল না।

কামিনী ভিতর বাড়ীতে সম্মুখে আসিয়া পথ আগলাইতেই ভবেশ তাহাকে এমন জোরে ধাক্কা মারিল যে পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা কাটিয়া গেল।

ভবেশ ছুটিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া ডাকিতে লাগিল, খোকা? শীগগির ছুটে আয়। এই দেখ তোর জন্যে ডালিম এনেছি। দেখে যা; দৌড়ে আয়, তোর বাবা এসেছে।

ভবেশ খোকা খোকা করিয়া জোরে চীৎকার করিতে লাগিল।

কামিনী টলিতে টলিতে ঘরের ভিতর আসিয়া জোরে কাঁদিয়া বলিল—খোকা নেই—আমাদের ছেড়ে গেছে!

—কোথায়?

কামিনী আঙ্গুল দিয়া উপরের দিক দেখাইয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিল।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ভবেশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, চিকিৎসা হয়েছিল ?

—অজয় বাবু ডাক্তার এনেছিলেন যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। ভবেশ নিজের হাতের ডালিমটীর দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বলিল, ডালিম খেতে পেয়েছিল ?

কামিনী মুখ নত করিয়াছিল, চোখ দিয়া অবিরত জল পড়িতেছে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। মনে হইতে লাগিল, ওগো তুমি একবার কাঁদ। মনটাকে হাল্কা কর। আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে। হঠাৎ ঝাপাইয়া স্বামীর কোলের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবেশ কামিনীর পৃষ্ঠে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রইল।

একটু পরে শক্ত হইয়া বলিল, অজয় বাবু বুঝি খুব বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন।

স্বামীকে ঠাণ্ডা করিতে কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সব চেয়ে বড় ডাক্তারই ত এনেছিলেন।

ভবেশ ছুটিয়া গিয়া অজয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমি জানতুম না যে আমার ভাই আছে। তা হলে কি এখানে

সেখানে ছুটোছুটি করি। কি যে উপকার আমার করেছিস। মার পেটের ভাই এর চেয়ে বেশী করতে পারে না।

—তুমি ঠাণ্ডা হও দাদা। আমি এমন কোন বিশেষ উপকার করিনি বরং তোমাকে বিশ্বাসঘাতক ভেবে টাকার জন্য নালিশ করতে গেছলুম।

ভবেশের সব কথা মনে পড়িল। এমন উপকারী ভাইএর পৈতৃক ঘড়ি চেন আংটী সে ঠকাইয়া রাখিতেছে।

—আচ্ছা দাঁড়া, বলিয়া ভবেশ লোকনাথের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কই দিন্, দলিল দিন্।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি কাপড়ের অগ্রভাগে বাঁধা দলিলটী খুলিয়া দিল।

দলিল ও কালি কলম হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভবেশ কামিনীকে বলিল, এখানে একটা সই কর।

স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কামিনী সই করিয়া দিল ভবেশ নিজেও সই করিল। ছুটিয়া যাইয়া লোকনাথের হাতে দলিল দিয়া ভবেশ বলিল, দিন টাকা দিন। ভাল করিয়া দলিলখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সে বলিল, কই, সাক্ষীর সই ত হয়নি।

ভবেশ অজয়কে ডাকিয়া সই করিতে বলিল।

অজয় দলিলখানি হাতে লইয়া পড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিল, তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কবে মারা গেলেন ?

কাতর ভাবে ভবেশ বলিল, আমি জানতুম না, নানা জায়গায় দুই তিন দিন ঘুরে শেষে তাঁদের কাছে টাকার জন্যে গিছলুম। যেয়ে দেখলুম কলেরায় তাঁরা মারা গেছেন। নিরুপায় হয়ে বাড়ী বেচে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে।

অজয় ভবেশের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, বৌদিদি বোধ হয় এখনও জানেন না, যে তার মা বাপ মারা গেছেন। দলিল বোধ হয় পড়েন নি।

—না পড়েন নি।

—তা বুঝতেই পেরেছি। এ বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। লোকেরা দখল নিতে এসেছিল, আমি অনেক করে হাতে পায়ে ধরে সময় নিয়েছি। কদিন আর এ বাড়ীতে থাকতে দেবে ?

—কিন্তু কোন উপায়ই ত নেই ভাই। তোমার টাকা দিতে হবে।

সম্মুখ হইতে অজয় চলিয়া গেল।

ভবেশ লোকনাথের নিকট টাকা চাহিল।

লোকনাথ বলিল এখনও সাক্ষীর সই হয় নি, সাক্ষীর সই হলে টাকা পাবে।

একটু পরেই ভবেশের মনে হইল কই টাকাত পেলেম না? ছুটীয়া যাইয়া অজয়কে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কই ভাই টাকা ত পেলেম না?

ভবেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অজয় বলিল, কি হবে টাকা নিয়ে এখন?

—তোমার দেনা শোধ দিতে হবে যে?

অজয় ব্যথিত মুখে বলিল, আর আমায় অপরাধী করবেন না দাদা...

মাতৃ পিতৃহীন কামিনীকে সান্ত্বনা দিতে ভবেশ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। কি করিয়া সে বলিবে যে কামিনী মাতৃপিতৃ হীন।

অজয় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বাড়ী দখল নিতে এসেছে। আমি তাদের বলে কয়ে সময় নিয়ে এসেছি। তারা তোমাকে একবার দেখতে চায়।

কামিনী অজয়কে গম্ভীরমুখে বলিল, ওঁকে বল ঠাকুরপো, আর শ্বশুর শাশুড়ীর ওপর অভিমান করা ওঁর উচিত নয়। তাদেরও ছেলে পিলে নাই। চল সেইখানেই আশ্রয় নেব। এ বাড়ীতে আমার আর থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এ বাড়ীর চারিদিকে সব সময় খোকাকে দেখতে পাই। ইস্,

হচ্ছে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে একটু সান্ত্বনা পাই।

ভবেশ পাশ হইতে কাঁদিয়া উঠিল। সে আশাও ভেঙে গেছে। দুরন্ত কলেরা রোগে একরাত্রিতে তোমার মা বাপ মারা গেছেন!

---

[২০]

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কামিনী ভবেশের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আর কত বিপদ সহ্য করতে হবে বল দেখি।

ভবেশের প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কি উত্তর দিবে, মুখে কোন সান্ত্বনা বাক্য যোগাইল না। স্ত্রীর চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া পাশে যাইয়া দাঁড়াইয়া কেবল চোখ মুছিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কামিনী বলিল—আমার ছোট বোনকে কোথায় রেখে এলে?

ভাঙ্গা গলায় ভবেশ উত্তর দিল, সে তোমাদের বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে তার দিদিমার বাড়ীতে গেছে।

কামিনী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিল, তুমি তাকে

নিয়ে এসো, তাকে দেখবার জন্য মন বড়ই কাঁদছে। বোধ হয় সে নেই, তুমি আমাকে ভোলাচ্ছ।

আস্তে আস্তে ভবেশ বলিল শান্ত হও, আমি তাকে শীঘ্রই নিয়ে আসব।

—কত বড়টী হয়েছে?

চোখ মুছিতে মুছিতে ভবেশ বলিল, আমি ত মেয়ে তাকে দেখতে পাইনি কামিনী।

অজয় এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের ঘরে আসিল। অজয়কে দেখিতে পাইয়াই লোকনাথ বলিল, দলিল ত এই পেলাম, এখন সাক্ষীর সই দিয়ে পাকা করে নিতে হবে। চলুন এই গাঁয়ের এক বাড়ীতে যাই...এই বলিয়াই লোকনাথ বাড়ীর বাহির হইল।

তখনই অজয়ের মনে পড়িল, যে বাড়ী বিক্রয়ের দলিল লইয়া লোকটী চলিয়া যাইতেছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। যে কোন মূল্যে হউক, ঐ দলিল তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। এ বাড়ী ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আর কয় দিনই বা থাকিতে দিবে। তখন এই দুঃস্থ পরিবার কোথায় দাঁড়াইবে।

অজয় ছুটিয়া যাইয়া লোকনাথকে পথে ধরিয়া জোর

করিয়া বলিল, দলিলটী ফিরিয়ে দিয়ে যান, আমরা বাড়ী বিক্রী করব না।

হাসিয়া লোকনাথ বলিল, তা হয় না বাবাজী, একবার জিনিষ বেচলে তা আর ফেরৎ পাওয়া যায় না।

—আমরা ত এখনও টাকা পাইনি।

সে বিষয় লোকনাথ অন্যথা করবে না। আমাদের বাড়ী গেলে লোকের সম্মুখে রীতিমত রসিদ নিয়ে টাকা সব দিয়া দিব, কোন মতে অন্যথা হবে না।

ক্ষোভের সহিত অজয় বলিল, আমরা টাকা চাইনে, আপনি দলিল ফেরৎ দিয়ে যান।

লোকনাথ চোখ তুলিয়া বলিল, তুমি কে হে ?

—আমি করুণা মুখার্জ্জির ছেলে, তোমার ঐ গ্রামের জমিদার।

হাসিয়া লোকনাথ বলিল, একদিন ছিলে বটে। কমলা দেবীকে মাতাঠাকুরাণী সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন, তিনিই এখন জমিদার।

অজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া ভাবিল, বেশ হয়েছে। কাঞ্চনের মোহ কেটে গেল, কিন্তু মাতৃস্নেহ !

সে শিহরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

মাথাটী জোরে ঝাকাইয়া লইয়া অজয় ভবেশের বাড়ী অভিমুখে আসিতে লাগিল।

ভবেশের সম্মুখে আসিতেই দেখিতে পাইল, মহাজন বাড়ী দখল লইবার জন্ম বসিয়া আছে। ভবেশের কাতর উক্তি, একদিন থাকিবার জন্ম করুণ প্রার্থনা, সব অরণ্যে রোদন হইতেছে। মহাজন কিছুতেই দখল না লইয়া ছাড়িবে না। বলিল, হয় ভাল ভাবে বেরিয়ে যান, নতুবা পিয়াদা দিয়ে সব জিনিষ পত্র রাস্তায় ফেলে দেব।

অজয়কে দেখিতে পাইয়া ভবেশ লজ্জায় মুখ নত করিল। কোন কথা না বলিয়া অজয় নিজের হস্ত হইতে বহু মূল্য আঙটীটী খুলিয়া লইয়া মহাজনের হাতে দিয়া বলিল, এই আংটীর বিনিময়ে আমি ছমাস সময় চাই। ততদিনে আপনার দেনা পরিশোধ করতে চেষ্টা করব!

ভবেশ অজয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিল, করছিস কি ভাই। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি সেও ভাল, তোর এ আঙটী দিতে হবে না।

অজয় ভবেশকে হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া মহাজনকে জোরে বলিল, কেমন রাজী আছেন, বলুন?

আঙটীর মূল্য অনুমান করিয়া হাসিতে হাসিতে মহাজন বলিল, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার এই ছোট বাড়ী নিয়ে

কোন উপকার হবে না। আমি চাই টাকা। এই আঙটীর মূল্য আমি বেশ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তোমার অন্তঃকরণ দেখে এ বাড়ী এক বছরের জন্য ছেড়ে দিলুম। এর ভিতর আমার টাকা কড়ি মিটিয়ে দিলে, আমি এদের বাড়ী পুনরায় লেখা পড়া করে দেব। তোমার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কি ?

অজয় ভবেশকে দেখাইয়া বলিল, উনি আমার দাদা।

অন্য কোন কারণ না থাকিলে পাতানো দাদাকে এত সাহায্য করে না, বলিয়া একটী কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিয়া মহাজন চলিয়া গেল।

অজয় ভবেশকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া কামিনীর সম্মুখে যাইয়া হাজির হইল ও বলিল, বউদি, শীগ্‌গীর চারটী রান্না করে দাও। আজকেই আমাকে যেতে হবে।

—আজিই কোথায় যাবি ভাই ?

অজয় উত্তর দিল, এ সংসার ত চালাতে হবে। তাই পয়সা উপায় করতে চললুম। তুমি দিন কয়েক বিশ্রাম কর।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভবেশ বলিল, তোকে পয়সা উপায় করতে হবে ?

অজয় উত্তর দিল, আজ আমি একেবারে নিঃস্ব দাদা, মাতৃস্নেহ, সম্পত্তি সব হারিয়েছি। টাকার মূল্য আগে বুঝতে পারিনি। যা হোক্, আমি চললুম। তোমার পায়ে

পড়ি দাদা, তুমি দিন কয়েক বিশ্রাম কর। আজ তোমরাই আমার অভিভাবক।

* * *

অজয় চলিয়া যাইবার দুইতিন দিন পরে কমলার প্রেরিত লোক অজয়ের খোঁজে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা লিখিয়াছে—

অজয় বাবু

মাতা মৃত্যুশয্যায়, তাকে শীঘ্র দেখতে আসবেন। তিনি ছটফট করছেন।

কমলা।

ভবেশ পত্র পড়িয়া তখনি কামিনীকে সঙ্গে লইয়া অজয়ের বাড়ী চলিল।

ভবেশের মন অজয়ের মাতার সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। অজয়কে এ সংবাদ জানাইয়া শীঘ্রই বাড়ী যাইতে বলিল এবং নিজেও সস্ত্রীক তথায় যাইতেছে লিখিয়া দিল।

* * *

যখন ভবেশ পৌঁছিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মাতা পুত্রে দেখা হইল না!

---

[২১]

অজয়ের বাড়ীতে আসিয়া কামিনী ভগিনী কমলার সাক্ষাৎ পাইল। অনেকদিন পরে—দুই বোনে মিলিত হইল।

কামিনী মাতাপিতা পুত্রশোক একসঙ্গে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। কমলার উপর স্বামীর ভার ন্যস্ত করিয়া কামিনী শয্যা আশ্রয় করিল। পুত্রশোকে দুইচক্ষে অশ্রুধারা বহিল এখন স্বামীর কাষ আর নেই।

কমলা যথাসাধ্য দিদি ও ভগ্নিপতির সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু সময়ে অসময়ে ভবেশ কমলার ঘরে যাইয়া নানাগল্পে অনেক সময় কাটাইয়া দিত।

দিদির অসুখ, একবার দেখে এসোনা দাদাবাবু...বলিয়া কমলা উঠিবার ভান করিল।

গম্ভীরভাবে ভবেশ বলিল, আমার কাছে যাওয়া তার পছন্দ হয়না, যদি কখনও যাই, বলেন, "চিরদিনত কষ্ট করে কাটালে একদিনও সুখের মুখ দেখতে পেলে না। এখন দিনকয়েক সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাও। কেন আমার এই রোগা শরীর আঁকড়ে ধরে থাকবে ··কমলার কাছে যাও, গল্প গুজব করগে।"

ভাবিতে ভাবিতে কমলা বলিল, হাঁ সে কথা সত্যি যে কষ্ট আপনারা পেয়েছেন, শুনলে ঠিক থাকা যায় না।

ভবেশ কমলার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, দেখ কমলা, সুখ বরাতে হল না ; তোমার দিদির ভাব ত জান—নির্লিপ্ত ; কিন্তু বেটাছেলেরা যে রূপ যৌবন চায় তা মোটেই বোঝে না। শরীরের উপর একটুও যদি যত্ন থাকিত। আমার কি মনে হয় জান, এই যে তোমার অনুগ্রহে খাওয়া পরার ভাবনা নেই এই বা কদিন, হয়ত বা...

দাদাবাবু, শুনেছি আপনি অজয় বাবুর বিশেষ বন্ধু... আপনার আর কষ্ট হবে না ; একটা চাকরীও ত তার অধীনে নিতে পারবেন।

কিন্তু জমিদারীর মালিক তুমি। তোমার স্বামীই জমিদার হবে। অজয়কে আমি ভাল রূপই জানি—যে অভিমানী সে বেথা করবে কি ?

কমলা লজ্জিত মুখে ভাবিতে লাগিল। সে সুন্দর মুখের পানে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে ভবেশ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

—কমলা ?

—বলুন জামাইবাবু, কি বলবেন।

মাথা নত করিয়া ভবেশ বলিল, আমি কি এখানে চিরকাল থাকতে পারিনে ? কথাটার মানে ঠিকভাবে ধরিতে না পারিয়া কমলা বলিল, ভবিষ্যতের কথা আমি কিরূপে বলব, বলুন।

নিজকে সামলাইয়া লইয়া ভবেশ বলিল, আমি কি বলছি বুঝতে পারছ না। যদি অজয় বাবুর সঙ্গেই বে নাই হয় —আমার আশা···

কি আশা—জোরের সহিত কমলা বলিল ?

কুলীন বামুনের দু বে' অন্যায় হয় না কমলা।

বসুন, বলিয়া দুঃখিত কমলা উঠিয়া দিদির কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।

কামিনী তখন বিছানায় শুইয়া উপরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। স্বর্গের দিকে তাকাইয়া পুত্রশোকাতুরা পুত্রের খোঁজ করিতেছিল।

কমলা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাকি দিদি।

সুপ্তোত্থিতের মত পাশ ফিরিয়া কামিনী বলিল, কি বলছিস্ কমলা ?

কমলা বিছানার উপরে দিদির পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া দিদির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। বোনের হাতটী টানিয়া হাতের মধ্যে লইয়া কামিনী বলিল, কিছু বলবি তুমি, বল না, আমার কাছে লজ্জা কি ?

কমলা মাথা নত করিয়া বলিল, দিদি তুমি শীঘ্র শীঘ্র সেরে ওঠ।

—আমার কি কোন অসুখ করেছে বোন, যে একথা বলছিস।

দিদির হাত জোরের সহিত টানিয়া কমলা বলিল, তা হলে তুমি শুয়ে থাকতে পাবে না।

—বেশ তাই করবো।

কাতর মুখে কমলা বলিল, আমি আর একলা এ সংসারের ভার সহ্য করতে পারছিনে। তুমি আমায় মাপ করো দিদি।

কামিনী বোনকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

একটু পরে শক্ত হইয়া বলিল, তাই ত ভাবি কবে চার-হাত এক হবে। এখন ত আবার এক বৎসর বাধা পড়ল।

লজ্জিত মুখে কমলা ছুটিয়া পলাইয়া যাইল। যাহা বলিতে আসিয়া ছিল বলিতে পারিল না।

নারীর রূপ

কামিনী সেদিন থেকে সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিতেন সত্য, কিন্তু সেই ময়লা জরা জীর্ণ কাপড় পরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাকে দেখিলে এ জমিদার বাড়ীর ঝি বলিয়াই মনে হইত।

কিন্তু ভবেশের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সব সময়ে ফিটফাট নব্য চোকরাটী সাজিবার চেষ্টা। কমলার বাক্স ভরা সাবান ভবেশের ব্যবহারে আসিতে লাগিল। চুণোট করা কাপড় না হইলে তাহার পরা হইত না। তাহাকে দেখিলে কে বলিবে কিছুদিন আগে ইহার একমাত্র পুত্র অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে।

ভবেশ যখনই কখনও ভাল রূপে সাজিত অমনি কমলার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইত। চুল যে দিন সব চেয়ে ভাল আঁচড়ান হইত কমলাকে না দেখাইলে সেচুলের বাহারই হইত না।

কমলা কিছু কিছু বুঝিতে পারিত, কিন্তু তিনি ভগ্নিপতি। নীরবে তাহার অনেক আবদার সে সহ্য করিত। দিদির নিকট বলি বলি করিয়াও কিছু বলিতে পারিত না। যখনই দিদির সন্মুখে যাইত, বোনকে কোলে করিয়া কামিনী মাতাপিতার কথা তুলিয়া বলিত, এ কি করছিস কমলা, একটু শরীরের প্রতি যত্ন কর। বাপমার বলতে আমরা এদুটী বোনই আ[illegible]।

কমলা মুখ নত করিয়া দিদির কোলে মুখ লুকাইত। কখনও দিদির সম্মুখে যাইয়া দেখিত—দিদি মায়ের আদরে সে যেটা খাইতে ভালবাসে নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতেছেন। কমলা চুপটী করিয়া দিদির কোলের কাছে বসিয়া তাঁহার কাপড় লইয়া নাড়াচাড়া করিত। ছেলে মানুষের মত খেলা করিত কিন্তু কিছু বলিতে সাহসে কুলাইত না।

দিদি একটু পরে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিতেন, তুমি বুড়ো হয়ে উঠেছিস দেখছি, যানা খেলা করে বেড়াগে।

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, দিদি আমি কি চিরদিনই ছোট আছি।

—না উনি বড্ডি বুড়ি হয়েছেন বলিয়া হাসিয়া ফেলিতেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য আমি ত আছি তোকে ভাবতে হবে না, বলিয়া কামিনী নিজের কাজে মনসংযোগ করিতেন। কমলা দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ করিয়া উঠিয়া যাইত।

---

[২২]

ভবেশের পত্র পাইয়া অজয় চাকরী স্থল হইতে ছুটি লইয়া আসিল।

ভবেশ দেখিল, অজয় বাহিরে থাকে। বাহিরেই নিজ হস্তে পাক করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করে। সংসারের কোন কথায় থাকিতে চায় না, এ দিকে শ্রাদ্ধ নিকটবর্ত্তী। কতকটা তজ্জন্য এবং কতকটা কমলার সঙ্গে পরামর্শ করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া ভবেশ কমলার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, শ্রাদ্ধের ত একটা আয়োজন করতে হবে—অজয়ত চুপ চাপ আছে।

কমলা এ পর্য্যন্ত অজয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিবার সুবিধা পায়নি। অজয় ইচ্ছা করিয়াই কমলার সম্মুখ এড়াইয়া চলিত। দু একবার ঝি দ্বারা ডাকিয়াও অজয়কে [illegible]

ভিতরে আনিতে পারা যায়নি। শেষে বিরক্ত হইয়া কমলাও স্রোতে গা ভাসাইয়া চুপ করিয়াছিল; হঠাৎ ভবেশের মুখে এ কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, এ বিষয়ে আপনার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তাঁরইত শুরু দণ্ড নামাতে হবে।

কমলার কথা যে সঙ্গত, একথা ভবেশ বুঝিতে পারিল। কিন্তু কমলার সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা দেখাইবার প্রলোভনও সে ছাড়িতে না পারিয়া বলিল, হাঁ সে কথা সত্যি, তারই এ বিষয়ে বেশী ভাবা উচিত, তবে কিনা সম্পত্তির মালিক এখন আমরা।

ভবেশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল। কমলা বাধা দিয়া জোরের সহিত বলিল, তাঁকে বলবেন তিনি আগেও যেমন সম্পত্তির মালিক ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন। আমরা তাঁর অনুগ্রহেই এখানে আছি...তাঁকেই শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করতে হবে, আমরা পারব না।

ভবেশ কমলার কথাগুলো সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না। যাহউক অজয়কে বলিতে হইবে ঠিক করিয়া বলিল, আচ্ছা তার কাছেই যাই; তোরা যে কি ভাবিস্ বোঝাই যায় না।

অজয় তখন সবে হবিষ্যান্ন শেষ করিয়া পুরোহিতের সঙ্গে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল, এমন সময়ে ভবেশ যাইয়া

হাজির হইল। তাঁহাদের কথা বন্ধ হইল। ভবেশ বলিল, ভাই শ্রাদ্ধ ত নিকটবর্ত্তী। একটা কিছু ঠিকঠাক কর্ত্তে হবেত। এ যার তার শ্রাদ্ধত নয়, বলিয়াই ভবেশ অজয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অজয় কোন উত্তর দিল না কিন্তু পুরোহিতঠাকুর অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হাঁ, সেই জন্মেই ত বাবু আজ আমায় ডেকে এনেছেন।

পুরোহিতঠাকুরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়া অজয় বলিল, তুমি কি মনে কর দাদা আমার মায়ের শ্রাদ্ধ, আর আমি চুপ করে বসে আছি।

ভবেশ বলিল, তা আমাকে জানালেই ত হয়—আমি বুঝব কি করে? ভবেশের অভিমানের সুরে ব্যথিত হইয়া অজয় বলিল, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে এক মাসের বেতন পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। তারই ভিতর ইতি মধ্যে দশ টাকা খরচ হয়ে গেছে। বাকী চল্লিশ টাকার ভিতর যা সম্ভব হয় তাই করতে হবে। কি বলেন পুরুত কাকা?

পুরোহিত ও ভবেশ উভয়েই অজয়ের কথায় বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়াছিলেন। ভবেশ এবার উত্তর দিল, কেন চল্লিশ টাকায় শ্রাদ্ধ হবে, তার মানে?

অজয় গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিল, মায়ের শ্রাদ্ধ বড় করে করতে সবারই সাধ হয়, কিন্তু আর টাকা কোথায় পাব ?

ভবেশ বলিল, এ অভিমান তোমার সাজেনা অজয়। আমি কমলার নিকট হতে আসছি। সে বললে, তোমার ইচ্ছা মত শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে।

—তাঁকে বলবেন দাদা, নিজের মায়ের শ্রাদ্ধ আমার নিজের টাকা দিয়েই করব। পরের অনুগ্রহে নাম কিনতে...

অজয় এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল। পুরোহিত বলিলেন, সবাই জানে অজয় তিনিও এই পরিবারের পুত্রবধূ হবেন। যদি মা ঠাকুরণ তাকে সম্পত্তি দিয়েই থাকেন প্রকারান্তরে তোমাকেই দেওয়া হয়েছে এখন এ অভিমান তোমার সাজে না বাবাজি! এ জমিদার বংশের মান মর্য্যাদার দিকে তাকিয়ে শ্রাদ্ধ করতেই হবে।

দৃঢ়স্বরে অজয় বলিল, জমিদার বংশের মান মর্য্যাদা যার হাতে ন্যস্ত হয়েছে সেই দেখবে। আমি এখন গরীব আমার এই চল্লিশ টাকার ভেতর যা হয়, তারই একটা ফর্দ্দ ঠিক করে ফেলুন। বৃথা সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। ভবেশদা, তুমি আমার সংকল্প ত বুঝতে পারলে; পরের টাকায় আমি মায়ের শ্রাদ্ধ করব না। ইচ্ছা হয় তাকে এই

কথাটা জানিও। আর কোন অনুরোধ কর না দাদা। তুমি অন্তত: এ শ্রাদ্ধে সাহায্য করবে, এ আমি জানি।

ভবেশ সহানুভূতি স্বরে বলিল, নিশ্চয়, তুই যে আমার ভাই! যে যা বলে বলুক. আমি আর কারোও কথায় কান দেবনা। পুরুত ঠাকুর, তা হলে আপনি সেই মত উদ্যোগ করুন। কেন পরের টাকা নিয়ে ভাই আমার মায়ের শ্রাদ্ধ করবে? আমিই ত বড় আমারই ত টাকা দেওয়া উচিত কিন্তু হতভাগার সে সঙ্গতি আর এখন নেই!

—দুঃখ করনা দাদা, অবস্থা ফিরলে তখন মায়ের নামে একটা ভাল কাজ করে মনের এ ক্ষোভ মেটাব; এখন এই চল্লিশ টাকাই আমার সম্বল···বলিয়া টাকা কয়টী অজয় বাহির করিল।

দুই ভাইয়ে শ্রাদ্ধের পরামর্শ হইতে লাগিল। পুরোহিত নিরুপায় হইয়া ফন্দি করিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, এ অভিমান কদিনের দেখা যাক, এরূপ অভিমান এ পরিবারে তিনি অনেক দেখিয়াছেন।

---

[২৩]

শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কমলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। জোর করিয়া ভবেশকে বলিল, শ্রাদ্ধের কি সত্যি একটা যোগাড় যন্ত্র করতে হবে না? সবাই ত দেখছি, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল।

ভবেশ নিজকে বাঁচাইতে বলিল, অজয় ত শ্রাদ্ধের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

কমলা অভিমান ভরে বলিল, কৈ আমি ত কিছুই জানি নে। আমি কি বাড়ীর কেউ নয়?

নিজকে সামলাইয়া লইয়া ভবেশ বলিল, মাত্র তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ। চল্লিশ টাকায় যা হয় তাই হবে। জাক জমক ত কিছু হবে না।

—চল্লিশ টাকার শ্রাদ্ধ মানে?

—অজয় বলে তার কাছে আর টাকা নেই।

উত্তেজিতভাবে কমলা বলিল, জমিদারী কি বিকিয়ে গেছে নাকি? মানসম্ভ্রম একটা আছে ত।

কমলার রাগমূর্ত্তিতে ভয় পাইয়া নিজের দোষ স্খলন করিতে ভবেশ অসাবধানতার সহিত বলিয়া ফেলিল, নিজের উপার্জ্জিত পয়সা দিয়ে সে মায়ের শ্রাদ্ধ করবে। কারো কাছে ভিক্ষা করবে না।

বিস্ময়ের সহিত কমলার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ভিক্ষা!

সে ত তাই মনে করে কমলা। আমি তাকে কিছুতেই অন্যরূপ বোঝাতে পারলুম না; বড়ই অভিমানী সে।

আচ্ছা বলিয়া কমলা উঠিয়া গেল।

দেওয়ানজীর তলব হইল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী আসিয়া দেখিলেন কমলা নিজের ঘরে বসিয়া কি ভাবিতেছে। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বলিলেন, আমায় ডেকেছ মা?

—আপনারা কি করতে আছেন বলুন শুনি। শ্রাদ্ধের আর কদিনই বা আছে। কিছু যোগাড় যন্ত্র করতে হবে না?

দেওয়ানজী বলিলেন, শুধু আমাদের দোষ দিলে কি হবে। অজয় বাবাজির নিকট দুচার দিন কথাটা উত্থাপন

করেছি তিনি কোন উত্তর দেন না। যেন কি একটা অভিমান তাকে ঘিরে রয়েছে।

—বেশ।—বলিয়া কমলা দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিল। একটু পরেই বলিল, আপনি এক কাজ করুন, এ বংশের একটী পুরাতন জাকাল গোছের শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ বাহির করে নিয়ে আসুন।

দেওয়ানজী ফর্দ্দ আনিতেই কমলা হুকুম দিল, আর কারো কাছে কিছু শুনতে হবে না। এই ফর্দ্দের দ্বিগুণ আয়োজন করে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করুন যেন কোন ত্রুটি না হয়।

যথা সময়ে বিপুল আয়োজনের সহিত শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। ভবেশ কখনও অজয়কে কখনও—কমলাকে সাহায্য করিল।

কামিনীর শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ছুটির অভাব দেখাইয়া অজয় তাড়াতাড়ি কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল।

---

[২৪]

ভবেশ এখন প্রতিনিয়তই কমলার কাছে নানা ক...
রসিকতা করিতে ছাড়িত না। সময়ে সময়ে উহা শিষ্টাচারের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। সে কমলাকে বুঝাইতে চাহিত যে কমলাই এখন তাহার আরাধ্য দেবী। কমলা ছাড়া সে আর এক দিনও কাটাতে পারে না—

সে দিন ভবেশ আসিয়া তাহাকে বেশ সোজাভাষায় বলিল—আর কত দিন এমন করে অকুলে ঢেউ গুনব কমলা?

কমলা যেন কিছু বুঝিতে পারে নাই এমন ভাব দেখাইয়া বলিল...এ আপনার কোন দেশী ভাষা? বেশ সোজা ভাষায় বলুন না...

ভবেশ কোন প্রকার গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া বলিল—

আমি তোমায় ভালবাসি কমলা—তোমায় আমি চাই—তোমায় আমি…

কমলা বাধা দিয়া বলিল—আপনার ও নামতা শুনতে চাই না—ছিঃ ছিঃ আপনি না আমার দিদির স্বামী…

ভবেশ হাসিয়া বলিল…কোন ক্ষতি নাই। কুলিন বামুনের সে বালাই নাই। এ হল শাস্ত্রের বিধি—ভাল বাসার টান যে বড় শক্ত জিনিষ…

কমলা মনে মনে ভগ্নিপতির উপর খুবই বিরক্ত হইল। কেন এ জীবটী দিদির অগাধ ভালবাসা বুঝতে পারে না। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে বাহিরের রূপ তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়িয়েছে। না দিদিকে বোঝাতে হবে। তিনি আর শরীরের উপর অযত্ন করতে পারবেন না। ভাল কাপড় চোপড় পরিয়ে তাকে মেজে ঘসে তুলতে হবে। পুরুষ শুধু গুনে বশীভূত হয় না। ক'জনারই বা তা বুঝবার ক্ষমতা আছে?

—পুরুষ যখন বাহিরের আকর্ষণটা চায়, তখন তাকে বাইরের রূপ দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। নতুবা স্বেচ্ছাচারীতার প্রশ্রয় পেলে সংসার ভেঙ্গে যাবে।

কমলা বলিল জামাই বাবু, আমার রূপটী বুঝি বড় ভাল লাগে?

ভবেশ হাসিয়া নির্লজ্জের মত বলিল খুব সত্যি কথা তোমারই ঐ রূপ আমায় দিন দিন পাগল করে তুলছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেউ কেউ নারীর রূপ দেখতে পায় না। আর সে কে জান—অজয়। সে বলে তোমাদের বাহ্যিক রূপ মনের দুর্ব্বলতার ঢাকবার অস্ত্র।

একটা কঠিন উত্তর কমলার মুখের কাছে আসিল— কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সাহস পাইয়া ভবেশ বলিল— অজয়ের ওপর যখন আর কোন আশা নাই বৃথা ভেবে আর কি হবে—তা ছাড়া এত বড় সম্পত্তিটা দেখা শুনার ভার···

কমলা হঠাৎ বাধা দিয়া বলিল—দিদির মত নিয়েছেন?

—হাঁ···

ক্ষিপ্রগতিতে কমলা উঠিয়া কামিনীর কাছে ছুটিয়া যাইয়া বলিল—দিদি?

—কি বোন?

কামিনী কমলাকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগ্নীর নিরুত্তর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—কিছু বলবি বোন?

কমলা মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি জামাই বাবুকে আমায় বিয়ে করবার মত দিয়েছ—

—হাঁ বোন! সে অনেক কষ্ট পেয়েছে—জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে—যদি একটু সুখ শান্তি পায়, ক্ষতি কি?

—আর তুমি? এত বড় একটা আঘাত চুপ করে সহ্য করতে পারবে?

—কি করবো বোন, সহ্য করবার জন্যই যে আমাদের জন্ম।—

আমার বরাতে সে কোনও দিন সুখের দেখা পেল না। আর যদি কেউ তাকে, সুখী করতে পারে।

কমলা দিদির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল দিদি, কি তুমি?

সস্নেহে বোনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কামিনী বলিল আমার বয়েস হয়েছে, সব হারিয়ে ফেলেছি। জীবনের সুখ শান্তি...

দিদি পুরুষেরা কি শুধু বাহিরের রূপটা দেখতে পায়, তোমার এই মন একটুও কি বুঝতে পারে না।

—না বোন সে আমার অদৃষ্ট।

কমলা দিদির পায়ে ধরিয়া বলিল, দিদি তোমার পায়ে পড়ি, এবার থেকে তুমি আর এরূপ ভাবে থেক না। পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন হতে চেষ্টা কর—ভাল কাপড় চোপড় পর। মুখে একটুখানি হাসি...

সলজ্জ ভাবে কামিনী বলিল তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না, সে বয়স আর আমার নেই। এখন আর আমরা চঞ্চল হতে পারি নে। তোর অত আর সাবধান করতে হবে না, যা—কাজে যা—

কমলা দিদির কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

---

[২৩]

সেদিন কমলা ঘরের ভিতর বসিয়া স্পষ্টই শুনিতে পাইল ভবেশ বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে বলিতেছে, টাকা দিতে হবেই আপনাকে...

দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, নিজের দায়িত্বে আপনাকে আমি আর টাকা দিতে পারব না, আপনি অনুমতি নিয়ে আসুন...

—কার কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে আমাকে? আপনি কি জানেন না, যে, সে আমার ভাবিপত্নী।

অপর পক্ষের উত্তর শোনা গেল না, যদিও কমলা কান খাড়া করিয়া সব কথাগুলি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল।

ভবেশের উত্তর শোনা গেল, আপনি কি বলতে চান যে আমাকে কমলার বে করার মত না থাকলে হিন্দুঘরে

এতবড় মেয়ে শুধু শুধু আইবুড়ো রয়েছে? অজয় ত আর কাউকে বে করবে না। আমরাও কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? এখন আমরাই ত ওর অভিভাবক। এর পরে কেউ কি ঐ মেয়েকে বে করতে আসবে? এতবড় মেয়ের কি হিন্দুর ঘরে বে হয়?

দেওয়ানজী জোরেই বলিলেন, ওসব আমায় শুনিয়ে লাভ নেই। মোট কথা, ওর অনুমতি না পেলে...

কমলার আর শুনিবার প্রবৃত্তি রহিল না। অজয়কে পত্র লিখিতে বসিল:

অজয় বাবু!

ভাগ্যদোষে উল্কার মত আমি এ সংসারে এসে পড়েছিলেম। ঠিক ইচ্ছা করে কি? এখন নিরুপায়।

হিন্দুর ঘরে মেয়েরা বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকতে পারে না। অনেক বাধা কিন্তু আপনাদের সে উৎপাত নাই জানি, তথাপি মায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা আমার মস্তকের গুরুভার হয়ে রয়েছে তাকে অস্বীকার করা বড়ই কঠিন।

আপনি ত নির্বিকারে এখনও রূপটাকে মোহের ফাঁদ মনে করে দূরে থাকতে ভাল বাসছেন, কিন্তু রূপ মনের আবরণ মাত্র।

আমি এখন বয়স্থা ব'লে অনেকের আলোচনার বিষয়

হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এ বংশের ভিতর থেকে সত্য হোক মিথ্যা হোক যদি কোন কুৎসা রটে, তজ্জন্য আপনার দায়িত্ব কিছু কম নয় ?

বিশেষ অনুরোধ করছি মায়ের আশা মনে করে আপনি যাহা ঠিক করেন জানাবেন। ভবেশবাবু অভিভাবক বলে গর্ব্ব করে বেড়ান, অথচ তাঁর সে ক্ষমতা নেই। মেয়েদের একটা আশ্রয়স্থল যতসত্বর পারা যায়, খুঁজে নেওয়া উচিত। আপনি তাদের যাই মনে করুন না কেন তারা তা নাও হতে পারে—

স্বার্থত্যাগ করে দয়া মায়ার ভিতরই যে তাদের বৰ্দ্ধিত হতে হবে। নিজের জন্যে কোন পরিশ্রম কোন কর্ম্মই তাদের সুখদায়ক নয়, ও তা উচিতও নয়।

আপনি আমাকে আর যা ভাবুন, আশা করি নির্লজ্জ ভাববেন না, সত্বর উত্তর দিবেন। পত্রটা গোপনীয়। কতদূর বাধ্য হয়ে অবিবাহিতা মেয়ে যে এই পত্র লিখেছে, আশা করি তা বুঝতে পারবেন। কুশল ইতি—

কমলা।

যথা সম্ভব সত্বর পত্রের উত্তর আসিল, অজয় লিখিয়াছে—

শ্রীমতী কমলা !

তোমার পত্র পেলাম। আশ্চর্য্য হলেম যে তুমি মনে

করতে পেরেছ যে, মা আমাকে যে সঙ্কল্প হতে টলাতে পারেন নি, তোমার এক সামান্য পত্রে আমার সে সঙ্কল্প ভেসে যাবে।

নারীর রূপের চেয়ে গুণটাই যে বড় সে আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু সে গুণ বিশেষ ভাবে চোখে না পড়লে বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয় আমার সংকল্প স্থির থাকবে।

শেষ কথা, আমার মৃত মাতার দোহাই অপরের নিকট থেকে আমি শুনতে আশা করি নে। তিনি মা আমি ছেলে, ছিলাম ও আছি।

আমি কি তোমার কোন কাজে অন্তরায় হয়েছি? বোধ হয় না, জ্ঞানত ত নয়। তুমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তোমার পক্ষে পথ সুগম। আমার ততটা সুবিধা নেই এবং আমার দ্বারা তোমার সাহায্য হওয়া অসম্ভব এবং তজ্জন্য তোমার দুঃখ করবারও কিছু নেই।

আমি দেখতে চাই, কামিনীর রূপ ও কাঞ্চনের শক্তি এক হয়ে কি প্রলয় সৃষ্টি করে, হয়ত করতেও পারে... আসি তবে— অজয়।

পত্র পড়িয়া কমলা স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেওয়ানজীকে ডাকিয়া কমলা চুপি চুপি কি আদেশ করিল। আদেশ বৃদ্ধ দেওয়ানজীর মনঃপুত না হলেও পালন করিতে হইল।

[২৬]

ভবেশ আসিয়া যখন কামিনীকে আহ্লাদের সহিত জানাইল, কমলা তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে তখন কামিনী কোন উত্তর দেয় নাই। কিন্তু এখন দেখিল সত্য সত্যই বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছে। আর ত অবিশ্বাস করা চলে না, কামিনীর মন অস্থির হইতে লাগিল।

কমলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি সত্যই ওকে বে করবি?

দুষ্ট হাসি হাসিয়া কমলা বলিল, কেন তুমি ত মত দিয়েছ দিদি!

—ওদের কি আর কিছুতেই খাঁই মেটেনারে কমি। বুড়ো হয়েছেন এখনও বে'র চেষ্টা।

গম্ভীর ভাবে কমলা বলিল, দিদি পুরুষ চিরদিনই রূপ

যৌবন চায় ? তুমি ত আমার কথা বিশ্বাসই কর না। একটুও শরীরের প্রতি যত্ন কর না।

—সববুঝি, এতদিন একসঙ্গে থেকেও উনি আমাকে চিনতে পারলেন না এটা আমার দুর্ভাগ্য।

—দিদি পুরুষ চিরকালই বিশ্বাস ঘাতক, [illegible]রের মনটাকে দেখতে চায়না। শুধু বাহিরের রূপই চা[illegible]

একটু থামিয়া কমলা বলিতে লাগিল, আ[illegible]ই কেউ বাহিরের রূপটাকে ঘৃণা করে। মায়ার ফাঁ[illegible]নে করে। তারা ভিতরটাই চেয়ে বেড়ায়।

কামিনী বলিল, তারা গুণের আদর জানে।

উত্তেজিত ভাবে কমলা বলিল, মিথ্যা কথা। তারা নিজকে ঠকিয়ে চলে।

দেবতারাই যখন ভক্তির সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যায়গায় নিজের আসন পাততে চান। ফুলবিল্বপত্রে নিজে সজ্জিত হতে চান, তখন মানুষ কোন ছার। তারা মুখে বলে রূপ চাইনে কিন্তু অন্তরের সহিত চান। মুখে সে কথা স্পষ্ট বলতে লজ্জা পান মাত্র—

—রূপ যৌবন কদিনের জন্য কুমি ?

—সে কথা সত্য। মানব জীবনই বা কদিন স্থায়ী। দিদি, রূপ মনের সদ্‌গুণের আবরণ মাত্র। উভয়ের এক

হওয়াটাই দরকার। শুধু রূপ কিংবা শুধু গুণ দিয়ে কাউকেও বশীভূত করে রাখা চলে না।

দুঃখিত ভাবে কামিনী বলিল, বয়সের সঙ্গে যে মেয়েদের রূপ চলে যায়। তাকে ত আর ধরে রাখা যায়না।

—যায় দিদি, বয়সের সঙ্গে রূপের ভেদ হয় মাত্র। শরীর সুস্থ থাকলে রূপ আজীবন স্থায়ী হয়। যাতে শরীর না ভেঙে পড়ে তাই আমাদের করা উচিত। আর যেটুকু কম পড়বে, সেটুকু ত সাজগোজে অঙ্গের আবরণে ঢেকে রাখা যায়; না করলে, যদি সংসার ভেঙ্গে যায় তজ্জন্য আমরাই দোষী।

দিদি, ওদের রূপ বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম...আর আমাদের রূপ দয়ামায়া স্বার্থত্যাগ সন্তান সন্ততি। তোমাকে আরও সাবধানে থাকা উচিত।

ছেলে মেয়ে নেই মনে পড়ায় কামিনীর চক্ষে জল আসিল। কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া শক্ত হইয়া বলিল, আমি দুর্ভাগা।

—না, দিদি তুমি দুর্ভাগা নও। নিজেকে শক্ত করে গড়ে তোল। ভবেশ ভাবুকে সুখী করা, তাকে রক্ষা করা তোমার কঠোর কর্তব্য। সে ভার তোমাকে বইতেই হবে। উদাসীন হলে যে তোমার পাপ হবে দিদি।

এত বয়সেও এত আঘাতেও যখন তিনি সরস হয়ে উঠচেন তখন তোমাকে যে তার মনোমত হতে হবে, বলিয়াই কমলা হাসিয়া ফেলিল।

কামিনী বলিল বে'র বন্দোবস্ত কেন হচ্ছে তবে?

কমলা চুপি চুপি দিদিকে কি বলিল। ভাবিতে ভাবিতে কামিনী উঠিয়া গেল।

* * *

যথা সময়ে বর পক্ষীয়ের সমস্ত খরচে অল্পব্যয়ে নিরাভরণা কমলা পার্শ্বের গ্রামের সচ্চরিত্র মধবিত্ত গৃহস্থের বধূ হইল।

---

[২৭]

স্কুলে যাইলে হেড মষ্টার মহাশয় অজয়কে ডাকিয়া বলিলেন, আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তজ্জন্য স্কুল কমিটী আপনাকে পনের দিনের মাহিনে দিয়ে বিদায় দেওয়ার সংকল্প করেছে।

নিরুত্তরে অজয় পনের দিনের মাহিয়ানা লইয়া চাকরিতে ইস্তাফা দিয়া আসিল।

বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, তাহার নামে এক রেজেষ্টারী পুলিন্দা আসিয়াছে। অজয় খুলিয়া পড়িল। কমলা লিখিয়াছে।

অজয়দা,—

আপনাকে জানাচ্ছি আজ আমি বিবাহিতা। কাজেই আপনাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

আপনার মাতার সম্পত্তির দানপত্র ও আমার ত্যাগ পত্র রেজেষ্টারী করে পাঠাচ্ছি। দিদির নিকট লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছি। যথা সম্ভব শীঘ্র এসে সমস্ত বুঝে নেবেন।

আমাকে অন্যরূপ ভাববেন না এবং আশা করি আপনার মত বদলাবেন ; সংসারী হবেন। ইতি

ছোট বোন কমলা।

অজয় পত্রখানা পড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কোন কাহটাত আর কমলা অসমাপ্ত রাখিয়া যায় নাই।

অজয় বাড়ীতে রওনা হইল। সমস্ত বুঝিয়া লইয়া দেখিল, ষ্টেটের একটা পয়সাও বিবাহে ব্যয় হয় নাই। অজয় দুঃখিত হইয়া কামিনীকে বলিল, বৌদি আপনি তাকে একটা গহনাও উপহার দিতে পারলেন না।

কামিনী দুঃখিত হইয়া বলিল, এত বড় একটা সম্পত্তির মায়া যে ত্যাগ করে গেল সে কি...

—না বৌদি, এ যে তোমার স্নেহের দান। সবাই যদি আমার মত মরুভূমির মন নিয়ে এসে থাকি ; তা হলে···

ঠাকুরপো, আমার নিজের বলতে ত কিছুই ছিল না সুধু দিদির আন্তরিক আশীর্ব্বাদ—তাও বোধ হয় ভাল মনে তোমার জন্যে করতে পারিনি। কি যে ধনুর্ভঙ্গ পণ তোমার...

অজয়ের গলা ভার হইয়া আসিয়াছিল নিজকে ঢাকিতে জোরের সহিত বলিল, আমি কি তোমার পর বৌদি, যে অভিমান করে তুমিও তাকে কিছু উপহার দিলে না ?

—না ঠাকুরপো এতে অভিমানের কিছুই নেই। আমি জীবনে বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছি—আমার ঐ একটী মাত্র বোন ছিল—জানতেও পারলুম না, সে কি অবস্থায় পড়ল। আজ কালকের দিনে তেমন কেউ কি, বিনাপয়সায় মেয়ে নেয়—বলিয়াই কমিনী চোখ মুছিল।

অজয় জোরে ছুটিয়া যাইয়া মায়ের বহুমূল্য গহনার বাক্স আনিয়া বলিল, বৌদি তুমি এইটে তাকে পাঠিয়ে দাও। এ মার স্ত্রীধন—মাত তাকে বড় ভাল বাসতেন !

কামিনী অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ গহনা এখন পাঠান কি ঠিক হবে ? সে ত নিতে পারবে না বরং যাকে সত্বর ভোলা দরকার, তার কথাই মনে করে দেবে।

ব্যথিত চিত্তে অজয় বলিল, বোনের দাবিও কি আমি হারিয়েছি ?

গম্ভীর ভাবে কমিনী বলিল, যতদিন না সে থা করে সংসারী হচ্ছে ততদিন কোন দাবাই আর তোমার তারওপরে থাকা উচিত নয়। যাবার সময়ে কতবার আমার হাত ধরে বলে গেছে "তুমি ত সব জান দিদি অজয়দা এলে বুঝিয়ে

বলো, তিনি যেন আমায় ভুল না বোঝেন। আর তাকে শীঘ্র শীঘ্র সংসারী হতে অনুরোধ করো” কামিনী আর বলিতে পারিল না। চোখ জলে পুরিয়া আসিল।

অজয় ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে বলিল, আবার বে?—না তা আর হবে না; এ ভুল আর শোধরাবে না—

গহনার বাক্স তথায় পড়িয়া রহিল।

---

[২৮]

সকাল বেলায় চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া কামিনী বলিল, ঠাকুরপো এরূপ করলে সম্পত্তি ক'দিন থাকবে ?

অজয় বিরক্ত ভাবেই বলিল, তা হলে আমায় কি করতে হবে শুনি ?

বিরক্ত হলে কি করব ঠাকুরপো, এইরূপ ভাবে ঘরের ভিতর মাথাগুজে পড়ে থাকলে ত সম্পত্তি চালান সম্ভব হবে না।

উপায় নেই, বলিয়া অজয় বিছানা হইতে উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না। পাশ ফিরিয়া শুইল।

কামিনী তথাপি দোরের উপর দাঁড়াইয়া বলিল, সে যাবার সময় আমায় বার বার করে বলে গেছে "দিদি মা অনেক আশা করে সম্পত্তি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমার কপাল দোষে আমি তার সে আশা পূরণ করতে পারলুম না। তুমি দেখ দিদি, যেন সম্পত্তির কোন অনিষ্ট না হয়।"

রাগিয়া অজয় বলিল, তিনি কি জানতেন না যে আমি সম্পত্তি চালাতে জানি নে। এত দরদই যদি সম্পত্তির উপরে ছিল তবে ছেড়ে গেলেন কেন? কার তরে রেখে গেলেন?

অজয়ের মনের ভাব ঠিক ধরিতে না পারিয়া কামিনী বলিল, কেন যার সম্পত্তি তাকেই ত দিয়ে গেছে। তুমি ত রয়েছ।

—আমি বৌদি, থাকা না থাকা সমান।

মৃদুভাবে কামিনী বলিল, তুমি ইচ্ছে করলেই ত তাকে ধরে রাখতে পারতে ঠাকুরপো? কত সুখের হত—এখন তোমাকেই এ সব ভার নিতে হবে বইকি?

হঠাৎ অজয় শক্ত হইয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই সব নিজে চোখে দেখব।

—এই গহনার বাক্সটা ফেলে এসেছিলে। এটা তুলে রাখ দাও, বলিয়া কামিনী গহনার বাক্সটা টেবিলের উপর [illegible]

—ওটা তুমি পাঠিয়ে দিতে পারলে না বৌদি?

—না তা হয় না ঠাকুরপো, এত বড় অপমান তাকে আমি করতে সাহস করিনে। সেও জমিদারী চালিয়ে গেছে।

—তাই চালিয়েছে, তুমি দেখবে জমিদারী কেমন ভাবে চালাতে হয়। কিন্তু একটা বড় ভুল করে ফেলেছি সেইটে শোধরান যাবে না।